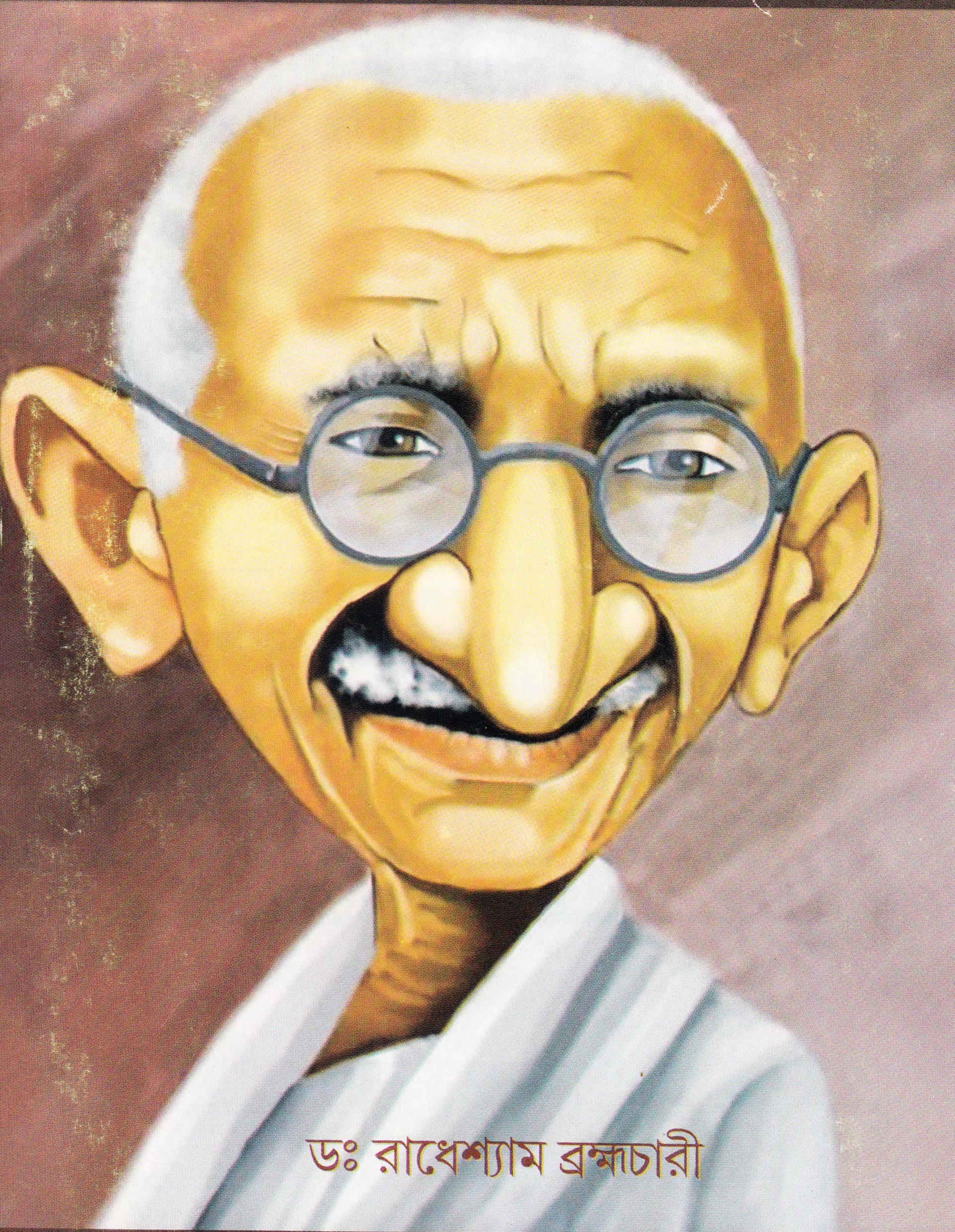
ভারতীয় ঐতিহ্য
ও গান্ধীবাদী অহিংসা



ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

ভারতীয় ঐতিহ্য
ও
গান্ধীবাদী অহিংসা

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

যদি কোন মুসলমান আমার ঘরে ঢুকে আমার বোনকে ধর্ষণ করতে থাকে,তবে আমি সেই মুসলমানের পায়ে চুমু খাবো

—(M.K.Gandhi, Navjivan, July 6,1926)

যদি কোন মুসলমান কোন পাঞ্জাবি মহিলাকে ধর্ষণ করতে চায়, তবে তার উচিত হবে সেই মুসলমানের সঙ্গে সহযোগিতা করা-দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মরার মত পড়ে থাকা—গান্ধী-

—(D Lapierre & L. Collins, Freedom at Midnight, Vikas, p-479)

তুহিনা প্রকাশনী

Bharatiya Oyeetijhya O Gandhibadi Ahingsha
By Dr. Radheshyam Bromhachari

Price : Rs. Twenty only

প্রকাশক ঃ
তুহিনা প্রকাশনী
৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১২

মূল্য ঃ ২০.০০ (কুড়ি) টাকা মাত্র

ঃ অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

যে সব অগণিত হিন্দু বীর নৃশংস মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, যাঁদের আত্মদানের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা পেয়েছে এবং অগণিত সেই সব মা-বোন যাঁরা মুসলমানদের হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার্থে আগুনে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদে পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ নিবেদিত হল।

— লেখক

গান্ধীবাদী অহিংসা হিন্দু ধর্মের পরিপন্থী একটি হাতুড়ে তত্ত্ব

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ।। (৩/১৬)

বশিষ্ঠ স্মৃতির উপরিউক্ত শ্লোকটি বলছে যে, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, ধারালো অস্ত্র হাতে হত্যায় উদ্যত এবং ধনসম্পদ, ক্ষেতখামার ও ঘরের স্ত্রীকে অপরহরণকারী, এই ছয় প্রকার দুষ্কৃতকারীকে আততায়ী বলে বিবেচনা করতে হবে। এই আততায়ীদের প্রতি কি রকম আচরণ করা উচিত সে প্রসঙ্গে মনুসংহিতা বলছে—

গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ণ্।। (৮/৩৫০)

অর্থাৎ, সেই আততায়ী যদি গুরু, কিংবা বালক, কিংবা বৃদ্ধ হয়, অথবা ব্রাহ্মণ কিংবা অতিশয় বিদ্বান ব্যক্তিও হয়, তবুও অগ্রসরমান সেই আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, উপরিউক্ত শাস্ত্রীয় বিধান শুধু মাত্র সেইসব আততায়ীদের জন্য, যারা কেবল একজন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি করতে উদ্যত। কাজেই যে সব বিদেশী আততায়ী আমাদের দেশ দখল করতে উদ্যত, দেশের সম্পদ লুঠ করতে উদ্যত এবং দেশবাসীকে হত্যা করতে উদ্যত, তারা হল জঘন্যতম আততায়ী এবং ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী তাদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তা সহজেই অনুমান করা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, যে সব জঘন্য আততায়ীর দল বিগত দু'শ বছর আমাদের দেশকে লুন্ঠন করল, আমাদের সম্পদ লুন্ঠন করে নিজেদের উদর স্ফীত করল, আমাদের দেশবাসীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের পশুর মত হত্যা করল, একটা অবাস্তব ও হাতুড়ে অহিংস মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে আমরা তাদের প্রতি অহিংস আচরণ করেছি।

অথচ উপরিউক্ত অহিংস-তত্ত্বের প্রবক্তারা দেশবাসীর কাছে দিনরাত এই মিথ্যা কথা বলে চলেছেন যে, অহিংসার নামে এই কাপুরুষতাই নাকি ভারতের ঐতিহ্য। এই আচরণ নাকি ভারতকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারতকে মহিমান্বিত করেছে। কিন্তু এটা সহজেই অনুমেয় যে, যারা নিজের দেশকে রক্ষা করতে পারে না, দেশের মানুষের জীবন-মান রক্ষা করতে পারে না, দেশের মা-বোনের সম্মান রক্ষা করতে পারে না, পক্ষান্তরে বিদেশী আততায়ীদের হাতে শুধু বিনা প্রতিবাদে মার খায়, সেইসব

হীনবীর্যদের কেউ কোনদিন সম্মান করতে পারে না। ভীরু কাপুরুষ বলে মনে মনে ঘৃণাই পোষণ করে।

এইসব অহিংসার পূজারীরা ভারতের অতীত ইতিহাস নিশ্চয়ই পড়েছেন। সেখানে কোথাও কি তারা দেখেছেন যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রতি এইরকম অযৌক্তিক অহিংস আচরণের কথা বলেছেন? দস্যু আলেকজান্ডার (সংস্কৃত অলোকসুন্দর-এর অপভ্রংশ) ভারত আক্রমণ করলে ভারতবাসী অস্ত্রের দ্বারাই তাকে প্রতিহত করেছিল ও পরাজিত করেছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য অস্ত্রের দ্বারাই বিদেশী শকদের প্রতিহত করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণকারীদের বেলাতেও ভারতবর্ষ কখনও অহিংসার আশ্রয় নেয়নি। ৭১১ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেমের সিন্ধুদেশ দখলের পর থেকে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ৪৮০ বছর ধরে ভারতবাসী অস্ত্রের দ্বারাই সীমান্তের মুসলীম আক্রমণকে প্রতিহত করেছিল। পরে রাণা সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ সিংহ ও রাজা শিবাজী অস্ত্রের সাহায্যেই ভারতকে বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলে রাম যুদ্ধ করেই সীতাকে উদ্ধার করেছেন। তিনি লঙ্কায় গিয়ে আমরণ অনশন কিংবা সত্যাগ্রহ করতে বসেননি। অযথা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য সন্ধির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যেই পাণ্ডবদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে মত দিয়েছেন এবং বল প্রয়োগের দ্বারাই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে বলেছেন।

কাজেই ভারতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কোথাও একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে ভারতবর্ষ অন্যায়কারী বা আততায়ীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেনি, পক্ষান্তরে অহিংসা করেছে। কাজেই যারা ইংরাজ দখলদারদের বিরুদ্ধে অনুসৃত গান্ধীর অহিংসার তত্ত্বকে ভারতের ঐতিহ্য বলে চালাতে চাইছেন, হয় ভারতের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, অথবা সব জেনে বুঝে বিশেষ কোন কারণবশত তারা অসত্য বলছেন।

ভারতের সনাতন ধর্ম তেজ ও বীর্যের ধর্ম এবং ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে সে কখনই প্রশ্রয় দেয়নি। উপনিষদের মুখ্য বাণীই হল 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য হও। কিন্তু এই ভয়শূন্য হওয়া পরপীড়নের জন্য নয়, দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য এবং পশুশক্তি ও অশুভশক্তিকে বিনাশ করার জন্য। এই কারণেই আমাদের সমস্ত দেবদেবী হাতে অস্ত্রধারণ করেন। বিষ্ণু গদা-চক্রধারী, মহাদেব পিনাকধারী, রাম ধনুর্বাণধারী আর দেবী দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। এই কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন ঃ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ সম্ভবামি যুগে যুগে এবং কংস ও জরাসন্ধের মত দুষ্টদের তিনি বলপ্রয়োগের দ্বারাই নিধন করেছেন।

গীতা যে হিন্দু ধর্মের সার তা সকলেই স্বীকার করবেন। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কি উপদেশ দিচ্ছেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অহিংসা প্রচার করেননি। বরং তিনি বলছেন যে, হে অর্জুন, যে সব আত্মীয়, বন্ধু, গুরু, পিতৃব্য, পিতামহ ইত্যাদিকে বধ করতে হবে বলে তুমি শোকে অভিভূত হচ্ছ, বর্তমানে তারা আততায়ী মাত্র এবং তুমি নিজেকে রক্ষা করতে যত্নবান না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে বধ করবে। কাজেই এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার ধর্ম হল আততায়ীকে বধ করা। তুমি নিষ্কামভাবে এই যুদ্ধকর্মে প্রবৃত্ত হও, অস্ত্রধারণ কর এবং শত্রু বিনাশ কর; ক্লৈব্য প্রাপ্ত হয়ো না। কাজেই গীতা অনুসার আততায়ীর প্রতি অহিংস আচরণ করা বা সত্যাগ্রহ করা ক্লীবতার নামান্তর মাত্র। অবশ্য এই অহিংসার প্রবক্তারা যদি বলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চাইতে তারা শাস্ত্র বেশী বোঝেন, তাহলে আর বলার কিছুই থাকে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল এই যে, উপরিউক্ত গান্ধীবাদী অহিংসার তত্ত্ব গীতা-বিরোধী এবং সেই কারণে তা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গীতার নিষ্কাম কর্মের পথ অনুসরণ করেই এই ভারতবর্ষ এককালে, শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সম্পদে ও বৈভবে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল এবং এটাও সমান সত্য যে, সেই গীতার শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হবার ফলেই ভারতবর্ষ আজ একটি হীনবীর্য, কর্মবিমুখ, কাপুরুষ তামসিক জাতির দেশে পরিণত হয়েছে। এই পতনও অবশ্য একদিনে হয়নি। মধ্যযুগে গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য ইত্যাদি অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তারা কেউই গীতার কর্মযোগের আদর্শে দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেননি। এ প্রসঙ্গে গীতাশাস্ত্রী শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখেছেন, 'বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ পথ, শঙ্করের মায়াবাদ, পরবর্তী ধর্মাচার্যগণের দ্বৈতবাদ, এ সকলে জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সবই আছে, কিন্তু কর্মের প্রেরণা নাই, কর্মের প্রশংসা নাই কর্মপোদেশ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে শঙ্খধ্বনি উঠিয়াছিল 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন', সে ধ্বনির আর কেহ প্রতিধ্বনি করে নাই। মধ্যযুগে সে কেবল শুনিয়াছে 'কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে' কর্মে জীবের বন্ধন, জ্ঞানেই মুক্তি, অথবা 'দন্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণ ভবেৎ' সন্যাস গ্রহণ করিলেই মানুষ নারায়ণ হয়।' (শ্রীগীতা, পৃ—১১০)।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন যে, মধ্যযুগের এই সব মহাপুরুষরা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চার পুরুষার্থের মধ্যে শুধু মোক্ষকেই প্রাধান্য দিলেন। কাজেই ধর্ম অবহেলিত হল, অর্থ ও কাম অবহেলিত হল। এই কারণেই অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে যে, গয়াসুর (অর্থাৎ বুদ্ধ) সাধারণ মানুষকে মোক্ষের পথ দেখিয়ে

সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)। একথা ঠিক যে, অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য তার অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের দ্বারা হিন্দু ধর্মে নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। তিনিও কিন্তু গীতার কর্মযোগের কথা বললেন না এবং দুঃখের কথা হল, তিনিও কর্মত্যাগ ও সন্যাসের উপরই প্রাধান্য দিলেন এবং বললেন,

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম ন তু বস্তুপলদ্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম কোটিভিঃ।। (বিঃ চুঃ ১১)

অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় বটে কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কেবলমাত্র বিচারের দ্বারাই তা সম্ভব এবং কোটি কোটি কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা কিছুমাত্র প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী, 'নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যোয়ো হ্যকর্মণঃ (৩/৮)', শ্রীশঙ্করাচার্যের মুখে সে বাণী প্রতিধ্বনিত হল না। বরং ভগবান যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, 'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং চেদহম্', অর্থাৎ, আমি যদি কর্ম না করি তবে আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমস্ত জীব কর্ম ত্যাগ করবে এবং জগৎ উৎসন্নে যাবে-তাই সত্যে পরিণত হল। সমস্ত দেশ জুড়ে কর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে গেল, তামসিক ন্যাড়া-নেড়ীতে দেশ ভরে গেল। দেশ উৎসন্নের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। গীতাচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্রের ভাষায়, 'সংসারে জাতবিতৃষ্ণ, কর্মবিমুখ, অদৃষ্টবাদীর সৃষ্টি, দলে দলে অনধিকারীর সন্যাস গ্রহণ, ধর্মধ্বজী ভিক্ষোপজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। এইরূপে কালে সমাজ হইতে রজোগুণের সম্পূর্ণ অন্তর্ধান হইল, সত্ত্বগুণাশ্রিত অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্ঞান-ভক্তির চর্চায় নিযুক্ত রহিলেন। তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রাতিভূত জনসাধারণ শত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া কপালং কপালং কপালং মুলং বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিল।'

এইভাবে ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একটি ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আত্মবিস্মৃত, তেজবীর্যহীন নপুংসক জাতির দেশে পরিণত হল। রাষ্ট্রস্বার্থের কথা ভুলে, সমষ্টির স্বার্থের কথা ভুলে, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি তমোগুনে আক্রান্ত হওয়ার ফলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হল। এবং এর ফলস্বরূপ একের পর এক বিদেশী আক্রমণকারীর পায়ের তলায় পিষ্ট হতে থাকল।

গান্ধীর অহিংসার তত্ত্ব বিদেশ থেকে ধার করা

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, বৃটিশ আমলে যে অহিংস সত্যগ্রহ নামক তত্ত্বের আবির্ভাব হল, তার প্রেরণা ভারতের উপরিউক্ত কর্মত্যাগ ও সন্ন্যাসবাদের তত্ত্ব থেকে এল না। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ডঃ অতুলচন্দ্র রায় লিখেছেন, "১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে

হেনরী ডেভিড থরু (Henry Devid Thoreau) নামে এক মার্কিন কবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক জনসভায় "civil disobedience" বা "আইন অমান্য" এই কথাটির ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তিনি এই প্রসঙ্গে কতগুলি প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধি হেনরী ডেভিডের এই প্রবন্ধগুলির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম আইন অমান্যের আদর্শ কার্যে রূপায়িত করেন।" (ভারতের ইতিহাস, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৫৮)। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, উপরিউক্ত অহিংসার তত্ত্বের প্রথম প্রেরণা এসেছিল Henry Devid Thoreau এর রচনা থেকে। এছাড়া অন্য কতিপয় বিদেশী লেখকের লেখার দ্বারাও গান্ধীজি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ অতুলচন্দ্র রায় উপরিউক্ত গ্রন্থের ৪৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "খ্যাতনামা লেখক রাসকিন ও খ্যাতনামা রুশ লেখক টলস্টয়ের রচনা (রাসকিনের Unto the Last ও টলস্টয়ের Kingdom of God) গান্ধীজিকে এক নতুন পথের সন্ধান দেয়। তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংস সত্যাগ্রহকে নীতি ও কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেন।"

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে ভারতীয় ঐতিহ্য তথা শাস্ত্র কোথাও এমন কথা বলেনি যে, পশুশক্তির সাথে বা আততায়ীর সাথে অহিংস আচরণ করতে হবে। আমরা এও দেখেছি যে, এ ব্যাপারে গীতার বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। কাজেই অহিংস সত্যাগ্রহের প্রণেতা গান্ধীর কাছে তার অযৌক্তিক অহিংসার তত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে গীতার অপব্যাখ্যা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তাই তিনি তার গীতাভাষ্য "অনাশক্তি যোগ"-এর ভূমিকায় লিখলেন যে, গীতার বর্ণিত যুদ্ধ কোন বাস্তব যুদ্ধ নয় "পরন্তু ভৌতিক যুদ্ধ বর্ণনের রূপকের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ নিরন্তর চলিতেছে ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। হৃদয়স্থিত যুদ্ধকে রসপূর্ণ আকার দেওয়া হইয়াছে।" (গান্ধী রচনা সম্ভার, গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, ৪র্থ খন্ড, উঃ ১১৮) অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধ কোন বাস্তব ঘটনা নয়। মানুষের মনে শুভ অশুভ শক্তির মধ্যে অবিরাম যে যুদ্ধ চলছে এটা তার রূপক মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে গীতা পৃথক কোন গ্রন্থ নয়, মহাভারতের একটা ছোট অংশ মাত্র। কাজেই যদি উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয় তাহলে বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে, গীতা সহ সমস্ত মহাভারতের ঘটনারই কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। তাই তিনি তার "গীতাবোধ" গ্রন্থের প্রস্তাবনায় বলেছেন, "মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু আমার কাছে মহাভারত ও রামায়ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়। ইহারা ধর্ম গ্রন্থ। আর যদি ইতিহাস বল, তবে উহা আত্মার ইতিহাস। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে কি হইয়াছিল তাহার বর্ণনা উহাতে নাই, পরন্তু আজ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যাহা চলিতেছে উহা তাহারই

প্রতিচ্ছবি।" (ঐ, পৃঃ ৬৩)। অথচ সেই পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষের মানুষ মহাভারতকে তাদের আদি ইতিহাস বলেই মান্য করে আসছে। শ্রীমদ্ভাগবৎ বলছে, "ইতিহাসঃ পুরাণাঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।" (১/৪/২০)। অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ গ্রন্থসমূহকে একত্রে পঞ্চম বেদ বলা হয়ে থাকে। বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে খুব সহজেই প্রমাণ করা চলে যে, উপরিউক্ত শ্লোকে ইতিহাসের নামান্তরে মহাভারতকেই উল্লেখ করা হয়েছে।

যাই হোক, মহাভারতের ঘটনা যদি নিছক রূপক ও কবির কল্পনা হয় তাহলে অবশ্যই বলতে হয় যে, কৃষ্ণ বলে বাস্তবে কেউ ছিলেন না, তিনিও কবির কল্পনা। তাই তিনি বলছেন, "গীতার কৃষ্ণ মূর্তিমন্ত শুদ্ধ পূর্ণজ্ঞান, কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে কৃষ্ণ নামক অবতার পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে না। মাত্র বলা হইতেছে, পূর্ণকৃষ্ণ কাল্পনিক। পূর্ণ অবতারের কল্পনা পরে আরোপিত হইয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৬৩)।

এই সমস্ত কথাবার্তায় অবাক হবার কিছু নেই, কারণ একটা অযৌক্তিক তত্ত্বকে খাড়া করতে দশটা কুযুক্তির প্রয়োজন হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অবতার কিন্তু কাল্পনিক, এই উক্তি স্ববিরোধী। কারণ ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী পরমব্রহ্ম বা ভগবান যখন মানব দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখনই তাকে অবতার বলা হয়ে থাকে। কাজেই বাস্তব অস্তিত্ব ছাড়া অবতার সম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বলা চলে যে, যে রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত হয়ে আসছে, তাকে হঠাৎ অবাস্তব বা কবির কল্পনা বলে চালাতে চেষ্টা করা সত্যের আপলাপ তো বটেই, উপরন্তু, শুধু বাতুলতা নয়, হাস্যকরও বটে। এই দুই গ্রন্থকে কাল্পনিক আখ্যা দিয়ে গান্ধী যে অতিশয় গর্হিত কাজ করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখেছেন, "কিন্তু গীতার আদ্যপান্ত আলোচনার মধ্যে 'যুদ্ধ কর, যুদ্ধ কর' এইরূপ প্রেরণা আছে। সে সকলের দ্বারা যে এই অর্ন্তযুদ্ধের প্রতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা বড়ই কষ্টকল্পনা বলিয়া বোধ হয়।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে অহিংসার তত্ত্ব গান্ধীজি বিদেশ থেকে ধার করে আনলেন, সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিশ্বাস সব কিছুকেই জলাঞ্জলি দিতে হল। ভারতের সমস্ত অতীত যুদ্ধকেই মানুষের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা মানসিক যুদ্ধ বলতে হল। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় আদর্শ পুরুষদের অবাস্তব ও কাল্পনিক বলতে হল। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ভারতবাসী অতীতে কোনদিন যুদ্ধ করেছিল সেটা মানতে গান্ধীজি একেবারেই রাজী ছিলেন না। তাই অনুমান করা চলে যে, আর একটু অগ্রসর হলে তিনি চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, পৃথ্বীরাজ, রাণাপ্রতাপ, ইত্যাদিকেও কাল্পনিক আখ্যা দিতেন এবং তাদের যুদ্ধকেও মানসিক যুদ্ধ বলে বর্ণনা করতেন।

কেন ভারতীয় শাস্ত্রের অহিংসা গান্ধীর পক্ষে গ্রহণীয় হল না

একটা বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আর তা হল গান্ধী তার অহিংসার তত্ত্ব বিদেশ থেকে ধার করতে গেলেন কেন? ভারতরে নিজস্ব শাস্ত্রসমূহের মধ্যে অহিংসার কথা কি কিছু কম আছে? ভারতীয় অষ্টাঙ্গ যোগের অষ্ট অঙ্গ হল, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এবং এর প্রথম অঙ্গ "যম"-এর মধ্যে যে যে নিয়মবিধি অন্তর্ভুক্ত তা হল—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যোগের প্রথম শিক্ষাই হল অহিংসা। এই অহিংসার স্বরূপ কি? কায়েন মনসা বাচা প্রাণিপীড়ন বর্জনম। মুলং যৎ সর্বধর্মানাং সা অহিংসা যোগিভির্মতা।। (যোগকারিকা-৬৪)। অর্থাৎ শরীর, মন বা (মর্মান্তিক) বাক্যের দ্বারা প্রাণীদের পীড়ন না করার নামই অহিংসা, যা সর্বধর্মের মূল এবং তাদৃশ অহিংসাই যোগিদের সম্মত। প্রাণহানি ও গুরুতর পীড়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যখন কোন যোগী অহিংসার পথে অটল থাকেন বা তার মনে হিংসার উদ্রেক না হয়, তখনই তার মনে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে (ঐ-৭০)। এইভাবে সেই যোগী যদি অহিংসাসিদ্ধ হন তাহলে কি হয়? অহিংসায়াঃ প্রতিষ্ঠায়াং যোগিনঃ সন্নিধৌ তদা। জন্তবঃ শাশ্বতং বৈরং ত্যজেয়ুস্তৎপ্রভাবাৎ।। (ঐ-৭৪)। অর্থাৎ সেই যোগীর প্রভাবে অভিভূত হয়ে বনের হিংস্র জন্তুরাও তার নিকটে হিংসা ঔ বৈরীভাব ত্যাগ করবে।

ভারতের অদ্বৈতবাদ বলে, "সর্বৎ খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "অহৎ ব্রহ্মাস্মি।" অর্থাৎ এই বিশ্বে দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু বিদ্যমান সকলই ব্রহ্ম এবং অমিও সেই ব্রহ্ম। কাজেই এই দুটি কথার মাধ্যমে মানুষে মানুষে তো বটেই, মানুষের সাথে জীব অজীব বা সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সব বিভেদ মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। তাই সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে কাউকে আঘাত কার বা হিংসা করা নিজেকে হিংসা করাই সামিল। কোন রকম হিংসাই তখন আর তার মধ্যে থাকতে পারে না, বা থাকা সম্ভব নয়। এই কারণেই গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "নির্বৈরঃ সর্বভুতেষু যঃ স মামেতি পান্ডব", অর্থাৎ সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানীর সাথে এই বিশ্ব সংসারে কারও কোন বৈরীভাব থাকে না এবং সেইরূপ নিবৈর স্থিতপ্রজ্ঞই আমাকে লাভ করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে অহিংসার মর্যাদা কিছু কম নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ঐ অহিংসার সাধনাকে ইন্দ্রিয়জয়ী সাধু মহাত্মা বা মুমুক্ষু যোগীদের জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তাকে সাধারণ মানুষের পালনীয় কর্তব্য বলে কোথাও বলা হয়নি। সাধারণ মানুষের জন্য নিষ্কাম কর্মের মার্গ বা ভক্তিমার্গই নির্দিষ্ট করা আছে। আমরা দেখেছি

যে, অষ্টাঙ্গ যোগের "যম" নিয়মবিধির মধ্যে ব্রহ্মচর্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই যে যোগী অহিংসা ব্রত পালন করবেন তাকে অবশ্যই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে। কিন্তু ব্রহ্মচর্য কখনই আপামর জনসাধারণের পালনীয় ধর্ম হতে পারে না। ঠিক তেমনি ব্যাধ, নিষাদ, কিরাত, অর্থাৎ পশুহনন করেই যাদের দৈনন্দিন জীবিকার সংস্থান করতে হয়, তাদের কাছে অহিংসার বাণী শুধু অবাস্তবতই নয়, সমাজের পক্ষে অনিষ্টকরও বটে।

এখানে আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি এক নিয়মবিধি, এক আচরণবিধি বা এক গ্রন্থের মধ্যে সীমিত নয়। সনাতন ধর্ম সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই এই সমাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে, সমাজের মানুষ যাতে সত্যাশ্রয়ী হয়, সমাজে যাতে অযথা হানাহানি ও রক্তপাত না ঘটে, সনাতন ধর্ম সর্বদা তারই পথনির্দেশ করেছে। তাই এখানে ব্রাহ্মণের ধর্ম ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এক নয়। সমাজে যে যেই কাজে নিযুক্ত রয়েছে, যে যেই দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছে, সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করাই তার ধর্ম। তাই এখানে অহিংসা শুধু সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, ইন্দ্রিয়জয়ী সাধু মহাত্মাদের ধর্ম বলেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দুষ্টের দমন ও সাধুজনের রক্ষা এবং যুদ্ধে শত্রু হনন করে দেশ রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাকে কখনই বলা হয়নি যে, শত্রু দ্বারে উপস্থিত হলে বা দেশ আক্রমণ করলে বা দেশ দখল করলে সেই দখলকারী বা আক্রমণকারী আততায়ীর সাথে অহিংসা করতে হবে। সেক্ষেত্রে হিংসার জবাব হিংসাতেই দিতে হবে এবং সেটাই প্রকৃত ভারতীয় ঐতিহ্য।

এ প্রসঙ্গে শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলেছেন, "শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে ধর্মতত্ত্ব এইরূপ বলিতেছেন, যস্মিন যথা বর্ততে যো মনুষ্যস্তস্মিং তথা বর্তিতব্য, স ধর্মঃ—অর্থাৎ তোমার সাথে যেযেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্মনীতি। *** ভক্তরাজ প্রহ্লাদ পৌত্রকে উপদেশ দিয়াছেন—ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা, অর্থাৎ সর্বদাই তেজ বা ক্ষমা প্রকাশ করা শ্রেয়স্কর নহে। অবস্থানুসারে ব্যবস্থা, সকল অবস্থাতেই ক্ষমা করাটা পণ্ডিতেরা মন্দ বলিয়া থাকেন (বনপর্ব)। *** বীর নারী বিদুলাও সত্রু কর্তৃক আক্রান্ত অথচ প্রতিকার পরাঙ্মুখ পুত্রকে র্ভৎসনা করিয়া বলিয়াছেন—উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জিতঃ। ক্ষমাবান্নিরমর্যশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান।। অর্থাৎ, হে কাপুরুষ, শত্রুনির্জিত হইয়া আর শয়নে থাকিও না, উঠ, যে নিয়ত ক্ষমাশীল, নির্জিত হইয়াও যে ক্রুদ্ধ হয় না, প্রতিকার করে না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে, অর্থাৎ ক্লীব (উদ্যাগপর্ব)।"

এ প্রসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। অহিংসক হিসাবে জৈনদের খ্যাতি সর্বাদিক। তারা এত অহিংস যে জল না ছেঁকে খায় না। অসুখ করবে এইজন্য নয়, জলের মধ্যেকার

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের যাতে প্রাণনাশ না হয় সেইজন্য। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, জৈন সাধুরা পাতলা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেন। দূষিত বাতাস শরীরের মধ্যে যেয়ে অসুখ করতে পারে এইজন্য নয়, বাতাসে ভাসমান ক্ষুদ্র জীবের যাতে প্রাণ নাশ না হয় সেইজন্য। জৈনরা জীবের প্রতি মানুষের হিংসাকে চার ভাগে ভাগ করেছে, যথা (১) আকস্মিক, (২) জীবিকার জন্য, (৩) আক্রান্ত হলে প্রাণ রক্ষার জন্য এবং (৪) অনিচ্ছাকৃত। আকস্মিক হিংসার ওপর কারও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই এবং ইচ্ছাকৃত হিংসা জৈন শাস্ত্র অনুসারে খুবই গর্হিত কাজ। কিন্তু এহেন অহিংসক জৈন ধর্মেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর হিংসাকে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই একজন আক্রমণকারী আততায়ী জৈন ধর্ম অনুযায়ীও বধযোগ্য। যাই হোক, হিন্দু ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত অজ্ঞতার কারণে গান্ধীর পক্ষে ভারতীয় অহিংসার তত্ত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এর পিছনে আর একটা কারণও ছিল। আমরা দেখেছি যে, হিন্দু ধর্মতো বটেই, এমন কি সর্বাধিক অহিংস জৈন ধর্মও বিদেশী আক্রমণকারীর সঙ্গে হিংসার সমর্থন করে। এইসব কারণের জন্যই সনাতন ভারতীয় অহিংসা তো বটেই, এমনকি জৈনদের অহিংসাও গান্ধীর পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারতো না, বা হতে পারেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ

যাই হোক, গান্ধী ১৮৯১ সালে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরলেন এবং তার পরের বছরই (১৮৯২) ব্যারিস্টারী করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করলেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। তখনকার দিনে ব্যারিস্টার হতে গেলে কোন পরীক্ষা দিতে হত না। কিছু দিন কোন বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারের তাবেদারের কাজ করলেই ব্যারিস্টার বা বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হওয়া যেত। তবে ভারতীয় ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট যথেষ্ট বিবেচিত না হবার ফলে গান্ধীকে আর একবার লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে হয়। প্রথমবার ফেল করার পর দ্বিতীয় বার কোন মতে গান্ধী সে পরীক্ষায় পাশ করেন।

যাই হোক, ঐ সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর যে সব অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাত, সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়রাও তার শিকার হত। অনেক ক্ষেত্রে গান্ধী নিজেও তার শিকার হলেন এবং ভারতীয়দের জন্য বিশেষ অধিকার দাবি করে বর্ণবিদ্বেষী নীতির বিরুদ্ধে প্রথম তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। এর ফল স্বরূপ ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ভারতীয়দের জন্য বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুর করে "ইন্ডিয়ান রিলিফ আইন" নামে একটি আইন প্রবর্তন করে।

এই ঘটনা তথাকথিত অহিংসবাদীদের কাছে গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের এক বিরাট সাফল্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, গান্ধীকে মহিমান্বিত করার জন্যই তৎকালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর গুরু গোপাল কৃষ্ণ গোখেলের পরামর্শে ওই আইন প্রবর্তন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশ থেকে বর্ণবৈষম্য উঠে গেলেও, যে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী আন্দোলন করেছিলেন, শুধুমাত্র সেখানেই ১৯৯৪ সালের মে মাস পর্যন্ত বর্ণবৈষম্য টিকে ছিল।

তবে একটা ব্যাপারে তিনি অবশ্যই সাফল্য অর্জন করেছিলেন, আর তা হল, তিনি বা তাঁর আন্দোলন যে কোন দিনও বৃটিশ শক্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেবে না, তা তিনি অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। সেই কারণেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের, এই সেদিনও, গান্ধীর পথে আন্দোলন করার পরামর্শ দিয়ে আসছিল। কারণ ওখানকার কৃষ্ণাঙ্গরা গান্ধীর পথে আন্দোলন করলে তাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হত। অত্যাচার-উৎপীড়নের দ্বারা অনাদিকাল ধরে তারা তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হত।

পৃথিবীতে এক মাত্র ভারতবর্ষেই কেন অহিংসার তত্ত্ব প্রথম জন্মলাভ করেছিল?

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, সমগ্র মানব সমাজেই কোন এক সময়ে পশু শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীকালে তা পশুপালকের সমাজে উন্নীত হয়। এই সময় পর্যন্ত পশুহত্যা করা এবং তার মাংস খাওয়া একটা দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, বা জীবন ধারণের অঙ্গ ছিল। তাই সেই সময় পর্যন্ত অহিংসা ও নিরামিষ আহার মনুষ্য সমাজে অজ্ঞাত ছিল। এরপর মানব সমাজ যখন কৃষিভিত্তিক সমাজে উন্নীত হল তখন পশুমাংসের উপর নির্ভরতা অনেক কমে গেল। আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে, ঋগ্বেদের যুগের অনেক আগেই ভারতীয় সমাজ কৃষিভিত্তিক সমাজে উন্নীত হয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয় সমাজেই হল একমাত্র মানব সমাজ যে অন্য সকলের আগে পশুপালক থেকে নিজেকে কৃষি-সমাজে উন্নীত করেছিল (S.Roy Chowdhury, Agriculture in Ancient and Mediaeval India, Cultural Heritage of India, R.K.M. Inst. Culture. Vol.-6)।

ভারতের বৈদিক সভ্যতা কত প্রাচীন তা আজও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। কয়েক বছর আগে আমেরিকার অ্যারোনটিক অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা (NASA) উপগ্রহ থেকে রামসেতুর ফটো তুলেছিল। সেইসব আলোকচিত্র পরীক্ষা করে নাসার বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ওই রামসেতু মানুষের দ্বারা তৈরি এবং

তা ১৭, ৫০,০০০ বছরের পুরানো। এই একটি সিদ্ধান্ত থেকেই অনুমান করা চলে যে, ভারতের বৈদিক সভ্যতা কত প্রাচীন। কাজেই বলতে বাধা নেই যে, সেই সুদূর অতীতেই ভারতবর্ষের মানুষ কৃষিকে ভিত্তি করে একটা সুসভ্য মানব সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছিল। আর এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, তখন পৃথিবীর অন্যান্য মানবগোষ্ঠী যাযাবর পশুপালকের জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। এর একটা মুখ্য কারণ হল, ভারতের উর্বর কৃষিজমির প্রাচুর্য ও সেই সঙ্গে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত।

এই প্রসঙ্গে সৌদি আরবের জনসমাজের কথা বলা যেতে পারে। মরুপ্রায় জমি ও বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা হেতু সেখানকার অধিবাসীরা আজও পশুপালকের স্তরেই পড়ে আছে। তাই তাদের সংস্কৃতিতে অহিংসা ও নিরামিষ আহারের কোন স্থান নেই। এ ব্যাপারে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, সৌর বছর গণনা। সূর্যের বার্ষিক গতি অনুসারেই ঋতু পরিবর্তন হয়। এবং এই ঋতু পরিবর্তনের সাথে কৃষির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকায় কৃষি কার্যের সাথে সৌর বছর গণনা একটা অত্যন্ত আবশ্যিক ব্যাপার। কিন্তু পশুপালকের স্তরে থেকে যাবার দরুণ আজও সৌদি আরবের লোকেরা চান্দ্র মাস দিয়েই কাজ চালিয়ে যেতে পারছে।

মানব সমাজের পশুপালক থেকে কৃষির স্তরে উন্নত হওয়া সভ্যতার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কারণ এই সময় থেকেই মানব সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন পরিশ্রমের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য মননসুলভ ব্যাপারে নিজেদের নিয়োজিত করতে সমর্থ হল। এই পরিবর্তনের ধারাগুলো ভারতে সকলের আগে, সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে বলেই আজ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সমৃদ্ধ বলে সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। আর এই কারণেই, একমাত্র, এই ভারতবর্ষের মাটিতেই অহিংসার তত্ত্ব ও নিরামিষ আহারের সামাজিক রীতি প্রসার লাভ করতে পেয়েছে।

যাই হোক, কৃষিকার্যের প্রসারের সাথে সাথে জীবনধারণের জন্য দৈনন্দিন পশুহত্যা বন্ধ হল বটে, তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মধ্য দিয়ে পুরানো দিনের সেই সব রীতি-নীতি ধর্মীয় আচার বা পশু বলির মধ্যে বেঁচে রইল। এই সময় অনেকের কাছেই এইভাবে বলি দিয়ে পশু-সম্পদ অযথা নষ্ট করা অযৌক্তিক মনে হতে থাকল এবং তাঁরা ঐ পশু সম্পদকে কৃষিকার্যে ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে থাকলেন। এইভাবে শুরু হল অহিংসার মধ্য দিয়ে পশু সম্পদ রক্ষার আন্দোলন। এই আন্দোলনকে বুদ্ধদেব ও মহাবীর পূর্বভারতে অধিক জনপ্রিয় করে তুললেন এবং ফলে পূর্বভারতে যখন পশুবধ প্রায়

উঠেই গেছে বলা যায়, তখনও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদিক ধর্ম ও তার পশুবধের যাগযজ্ঞ বেশ জোরদার ভাবেই চলতে থাকল।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হচ্ছে যে, অহিংসা নীতির ভারতে জন্মলাভ করার প্রধান কারণ হল তার কৃষিযোগ্য উর্বরা জমির প্রাচুর্য, অপর্যাপ্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে পশু-মাংসের উপর নির্ভরতা হ্রাস। কাজেই অকারণ পশুবধ নিবারণের মধ্য দিয়ে যে অহিংসা জন্ম নিল, তার সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ বা জীবিকার জন্য হিংসার মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। অহিংস শাসক হিসাবে সম্রাট অশোকের খ্যাতি সর্বাধিক। সেই অশোকের সময়ও ব্যাধ, নিষাদ, কিরাত প্রভৃতি লোকদের জীবিকার জন্য হিংসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়নি। ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত সামান্য কয়েকটি পশুপাখীই তখন অ-বধযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। সম্ভাব্য বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য এক বিশাল ও সুশিক্ষিত সৈন্য বাহিনীও সম্রাট অশোক প্রস্তুত রেখেছিলেন।

বাংলায় ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভ

এরপর প্রায় দু হাজার বছর পার হয়ে গেছে এবং অনধিক ৭০০ বছর ভারতবর্ষ মোগল পাঠানের গোলামী করেছে। তারপর আবির্ভাব হয়েছে ইয়োরোপীয়, বিশেষ করে ইংরাজ জাতির। তারা প্রথমে বণিকের বেশে ভারতে এসে উপস্থিত হল এবং ধীরে ধীরে ভারতের শাসন ক্ষমতা কব্জা করে ফেলল। হাজার হাজার বছরের পুরানো ভারতের শিল্প-বাণিজ্যকে তারা নির্মমভাবে ধ্বংস করল এবং ভারতকে বিলাতি পণ্যের একটি বৃহৎ ও লাভজনক বাজারে পরিণত করল। দেশীয় যে বেনিয়া শ্রেণী এতদিন ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের হস্তচ্যুত হল। ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরাজরা ইয়োরোপের অনুসরণে ভারতে জমিদারী বা সামন্ত প্রথার সৃষ্টি করল এবং এইভাবে তারা শিল্পে অগ্রসর ভারতকে একটা কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করল।

ভূমিরাজস্ব আদায়ের কাজটা অত্যন্ত জটিল এবং বৃটিশ কর্মচারীদের পক্ষে ঘরে ঘরে গিয়ে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করাটা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তাই লর্ড কর্নওয়ালিস দেশীয় লোকদের দিয়ে এই শ্রমসাধ্য কাজটা করিয়ে নিতে মনস্থির করলেন এবং প্রথমে ১০ বছরের জন্য ও পরে চিরস্থায়ীভাবে তাদের জমির বন্দোবস্ত দিলেন।

পুরানো ব্যবসা-বাণিজ্য হস্তচ্যুত হবার ফলে বেনিয়ারা রাতারাতি জমির স্বত্ব নিয়ে জমিদার হয়ে বসল। এই জমি বন্দোবস্তের মূল শর্ত ছিল এই যে,যত খাজনা আদায়

হবে তার ১১ শতাংশ পাবে জমিদার এবং বাকী ৮৯ শতাংশ পাবে ইংরাজ। এই খাজনার কোন সুনির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমা না থাকায়, প্রথমত নিজেদের স্বার্থে এবং দ্বিতীয়ত ইংরাজ প্রভুদের খুশি করার জন্য, জমিদাররা অত্যাচার উৎপীড়নের মাধমে যতপারে খাজনা আদায় করে দেশকে নিঃস্ব করে ফেলল। অপর দিকে ইংরাজের নেক নজরে না থাকলে জমিদারী হাতছাড়া হবার ভয় আছে। এইভাবে ধীরে ধীরে এই জমিদার শ্রেণী বৃটিশের পদলেহী ভৃত্যে পরিণত হল, এবং ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ হয়ে উঠল। অপরদিকে এই গোলামীর পুরস্কার হিসাবে বৃটিশ তাদের "রাজা", "রায়বাহাদুর" ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করতে থাকল। এ ব্যাপারে সমস্ত ঐতিহাসিকগণই একমত যে, এই জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন না পেলে ইংরাজের পক্ষে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হত না।

উপরিউক্ত তাবেদার জমিদার শ্রেণী ছাড়াও আর একটি পদলেহী শ্রেণী ঐ সময় ভারতের মাটিতে জনালাভ করল। ইংরাজরা ভারতে বিদেশী, তাই এখানে ব্যবসা করতে হলে কিছু দেশীয় ঠিকাদার, দালাল ইত্যাদির প্রয়োজন এবং এভাবেই জন্ম নিল দ্বিতীয় তাবেদার শ্রেণী, বৃটিশের দাক্ষিণ্যে যারা ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ নগরীর পত্তন হবার সাথে সাথে এরা ঐ শহরগুলিতে এসে বসবাস করতে শুরু করল। এদের মধ্যে সব থেকে অগ্রগণ্য হল বোম্বাইয়ের পার্শী সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং কোলকাতার এক শ্রেণীর বাঙালী ও মাড়োয়ারী সম্প্রদায়। বৃটিশের দালালী করে এরা যে মূলধন সংগ্রহ করল তাই দিয়ে তারা পরবর্তীকালে ভারতের নয়া পুঁজিপতি শ্রেণী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল।

দু-একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। বর্তমান টাটা শিল্প-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা নুসেরনজী টাটা বোম্বাই নগরীর পত্তন হবার সাথে সাথে আদি বাসস্থান সুরাট ত্যাগ করে বোম্বাইতে চলে আসেন এবং বৃটিশের ঠিকাদার হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। পরে আবিসীনিয়ার সঙ্গে বৃটিশের যুদ্ধ বাধলে তিনি ঐ যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদের পানীয় জল সরবরাহ করার বরাত পান। ক্যানেস্তারা টিনে করে শুধু জল সরবরাহ করে তিনি বেশ কিছু টাকার মালিক হন। পরে বৃটিশের দাক্ষিণ্যে তিনি বৃটেনে কার্পাস তুলো রপ্তানির ঠিকাদারী পান। ঐ সময় ভাগ্যগুণে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং বৃটেনে আমেরিকান তুলো আসা বন্ধ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ বৃটেনের বাজারে ভারতীয় তুলার চাহিদা ও দাম দুই-ই অসম্ভব বৃদ্ধি পায় এবং তুলো রপ্তানি করে নুসেরনজী প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। পরে সেই টাকা দিয়ে তেমনি নাগপুরে একটা পুরানো কাপড়ের কল, এম্‌প্রেস মিল কেনেন এবং এইভাবে বর্তমান টাটা শিল্পগোষ্ঠির পত্তন করেন।

কলকাতা নগরীর পত্তনের সাথে সাথে নীলমণি ঠাকুর পূর্ববঙ্গের আদি বাসস্থান ত্যাগ করে জোড়াসাঁকোতে এতে বসবাস করতে শুরু করেন। পরে নীলমণির পৌত্র দ্বারকনাথ বৃটিশের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় কয়লা খনি, খবরের কাগজ, চিনির কল ও আরও নানারকম ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর টাকার মালিক হন। বৃটিশের প্রতি তার অবিচল আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসাবেই তিনি প্রিন্স আখ্যা পান। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত বৃটিশ অফিসারদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথ তার নৃত্যনাট্যগুলি লিখতে ও মঞ্চস্থ করতে শুরু করেন আর এই কারণেই প্রথম দিকে রচিত নৃত্য নাট্যগুলির (যেমন বাল্মীকি প্রতিভা, কাল মৃগয়া ইত্যাদি) বেশীরভাগ গান পাশ্চাত্য সুরে রচিত।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী থেকে এটা সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে যে, বৃটিশের তাবেদার, পদলেহী ভূস্বামী, দেশীয় রাজা ও নব্য পুঁজিপতিদের পক্ষে ইংরাজের বিরোধিতা করা ছিল একেবারেই অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ ভারতে থাকলেই এদের লাভ। কিন্তু মুশকিল হল অন্য দিক দিয়ে। দেশের সাধারণ মানুষ বৃটিশ-বিরোধী হয়ে উঠল। ১৮৫৭ সালের ক্ষত তখনও তার গা থেকে সম্পুর্ণভাবে মুয়ে যায় নি। উপরন্তু জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন পাল ও লালা লাজপৎ রায়ের মত চরমপন্থী নেতাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং তাদের পূর্ণস্বরাজের দাবি বৃটিশকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলল।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বৃটিশ ও তার তাবেদারদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল কোন নতুন তত্ত্বের দ্বারা চালিত এক নূতন ধরনের নেতৃত্বের, যাতে করে তাদের স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে। তারা নতুন ধরনের এক তত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যে তত্ত্ব কোনদিনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না। তারা নতুন ধরনের এক নেতৃত্বের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যে নেতৃত্ব হবে বাইরে থেকে বৃটিশ-বিরোধী কিন্তু ভিতর থেকে বৃটিশের অনুগত। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধী ও তার অহিংস নীতি যে কোনদিনই বৃটিশের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে না তা ইতিমধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

এছাড়াও ছিল বৃটিশ জাতি ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গান্ধীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। এ প্রসঙ্গে ডঃ অতুলচন্দ্র রায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখছেন, "প্রথম জীবনে তিনি (গান্ধী) বৃটিশ-বিরোধী ছিলেন না। এবং প্রকৃতপক্ষে বুয়োর যুদ্ধ (১৮৯৮) ও জুলু বিদ্রোহের সময় (১৯০৬) তিনি বৃটিশকেই সমর্থন করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বৃটিশ-বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেই ছিলেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, তিলক প্রমুখ নেতৃবর্গের মতাদর্শ গান্ধীজিকে প্রভাবিত

করিতে পারে নাই" (পৃঃ ৪৮৬)। তিনি আরও লিখছেন, "প্রথম দিকে গান্ধীজি ছিলেন বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত। ইংরাজের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। ইংল্যান্ডের সহিত ভারতের যোগাযোগকে তিনি ভারতের পক্ষে মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিতেন" (পৃঃ ৪৮৮)।

গান্ধীর বৃটিশ অনুগত্য

১৮৯১ সালে গান্ধী ব্যারিস্টার হয়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে ফিরে এলেন। পরের বছরই তিনি দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানীর হয়ে মামলা লড়তে দক্ষিণ আফ্রিকায় রওনা হলেন। দাদা আবদুল্লা অ্যান্ড কোম্পানীর সঙ্গে ত্যাবজী হাজি খান নামে একজন প্রবাসী ভারতীয়র আমলে চলছিল। এই সময় তিনি কতগুলি প্রবন্ধ লেখেন এবং তা শ্রী গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে পাঠান এবং গোখেলের মতে ওই প্রবন্ধগুলো ছিল অর্থহীন জঞ্জাল মাত্র। এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, গান্ধী তাঁর সারা জীবনে একটি মাত্র সার্টিফিকেট যোগার করতে পেরেছিলেন, আর তা হল ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট। ১৮৮৭ সালে তিনি কোন মতে টেনে টুনে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করতে সক্ষম হন। মোট ৬২৫ নম্বরের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ২৪৭নম্বর।

সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-বিদ্বেষী ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকার নিগ্রোদের এবং সেই সঙ্গে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গান্ধী নিজেও এই জাতি বিদ্বেষের শিকার হয়েছিলেন। এইখানে গান্ধী রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে তাঁর নিজস্ব অহিংসা নীতির প্রথম প্রয়োগ করেন। তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য বিশেষ কিছু নাগরিক অধিকার অর্জন করা। পরবর্তীকালে এই অহিংস আন্দোলন সত্যাগ্রহ নামে খ্যাতি লাভ করে। ১৯১৪ সালে দঃ আফ্রিকার সরকার এই আন্দোলনের ফলে (?) অনাবাসী ভারতীয়দের বিশেষ কিছু সুযোগ সুবিধা দান করে। এই ঘটনাকে গান্ধীর ভক্তরা গান্ধী ও তাঁর অহিংস আন্দোলনের এক বিশাল সাফল্য বলে বর্ণনা করে থাকে।

কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সারা পৃথিবী থেকে অনেক আগে বিদায় নেওয়া সত্ত্বেও যে দঃ আফ্রিকায় গান্ধী তাঁর অহিংস আন্দোলন করেছিলেন, সেখানে তা ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই সেদিনও দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত শাসকরা নিগ্রোদের গান্ধীর মত অহিংস আন্দোলন করতে পরামর্শ দিত। সব থেকে বড় কথা হল যে, গান্ধী তাঁর অহিংস আন্দোলন ও অন্যান্য কাজকর্মের দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, তিনি ছিলেন ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ সংস্কৃতির প্রতি

অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল অত্যন্ত অনুগত একজন প্রজা এবং তাঁর কাছ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিন্দুমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধী বৃটিশ রাজশক্তির প্রতি তার আনুগত্য দেখাবার জন্য বিভিন্ন জনসমাবেশে বৃটেনের জাতীয় সঙ্গীত গাইতেন। তবে সেই গানের দুটো পংক্তি

"Scatter her enemies, and make them fall;
Confound their politics;
frustrate their knavish tricks"

দুটো পংক্তির মধ্যে হিংসা আবিষ্কার করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃটিশরাজের প্রতি তার ভক্তি অটুট থাকে। গান্ধী সব থেকে খ্যাতনামা জীবনীকার শ্রী ধনঞ্জয় কিরের ভাষায়, "দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধী বৃটিশরাজের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করার কোন সুযোগের অপচয় করতেন না। ১৯০১ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়। গান্ধী তখন টেলিগ্রামের মাধ্যমে তার শোকবার্তা ইংল্যান্ডে পাঠান, ডারবানে ভিক্টোরিয়ার মূর্তিতে মালা দেন এবং ভিক্টোরিয়ার ছবি স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেন। এরপর পঞ্চম জর্জ ইংল্যান্ডের রাজা ঘোষিত হলে গান্ধী বৃটিশরাজের প্রতি তার আনুগত্য দেখবার জন্য ইংল্যান্ডে টেলিগ্রাম পাঠান এবং তাতে লেখা ছিল "The Indian residents of this country (i.e. South Africa) sent congrafulatory cablegrams on the occasion, thus declaring their loyalty." অর্থাৎ, "এই দেশে (অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায়) বসবাসকারী ভারতীয়দের তরফ থেকে, এই টেলিগ্রামের মাধ্যমে তাদের শুভেচ্ছা ও আনুগত্য প্রকাশ করা হল।"

হল্যান্ডের ডাচরাও দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের উপনিবেশ তৈরি করেছিল। সেখানে ডাচদের বুওর বলা হত। এর ১৮৯৯ সালে বৃটিশ ও ডাচদের মধ্যে যুদ্ধ লাগে, ইতিহাসে যাকে বুওর যুদ্ধ বলে। সেই সময় যুদ্ধে আহত বৃটিশ সৈন্যদের সেবা শুশ্রূষা করার জন্য গান্ধী সেখানকার ভারতীয়দের নিয়ে ১১০০ লোকের একটি রেডক্রশ বাহিনী তৈরি করেন। তার এই কাজের জন্য বৃটিশ সরকার তাকে পরে একটি মেডেল ও প্রশংসাপত্র দান করে। বৃদ্ধ বয়সেও গান্ধী গর্বের সঙ্গে সেই সব কথা স্মরণ করতেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখাতে কি করে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করেও বুওর যুদ্ধে আহত সৈন্যদের সেবা করেছিলেন তা গল্প করতেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বৃটিশ সরকার সারা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কাজ করে।

বৃটিশ সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার মূল অধিবাসী নিগ্রোদের ওপর নানা রকম জুলুম, শোষণ ও অত্যাচার চালাত। তারা তাদের বলত জুলু। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জুলুরা ১৯০৬ সালে বিদ্রোহ করে, ইতিহাসে যাকে "জুলু বিদ্রোহ" বলে। বৃটিশ সাকারকে

খুশি করতে গান্ধী তখন বৃটিশ সরকারের পক্ষ নেন। অথচ ভারতের এক কালা আদমী হয়ে তার উচিত ছিল জুলুদের সমব্যথী হওয়া এবং তাদের পক্ষ নেওয়া। কিন্তু চরম লজ্জার বিষয় হল, গান্ধী নিজেও একই রকম অত্যাচারের শিকার হওয়া সত্ত্বেও, অত্যাচারী বৃটিশের পক্ষ নিলেন। তার এই ঘৃণ্য আচরণের সপক্ষে সাফাই গাইতে তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখলেন, "But I then believed that the British Empire existed for the welfare of the world. A genuine sense of loyalty prevented me from even wishing ill to the Empire." অর্থাৎ সেই সময় আমি ভাবতাম যে, সমগ্র জগতের মঙ্গলের জন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছে। তাই তার প্রতি চরম আনুগত্যের খাতিরে আমি বৃটিশের বিন্দুমাত্র ক্ষতি চিন্তা করতে পারতাম না। এবারেও বৃটিশ সরকার তার কাজের জন্য তাকে একটি সোনার পদক ও কাইজার-ই-হিন্দ উপাধিতে ভূষিত করে।

আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে এবং এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে, তা হবে ভারতের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকর। এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, বৃটিশ রাজশক্তির ওপর তার এই অবিচল ভক্তি ও আনুগত্যের জন্যই ভারতের বৃটিশ সরকার গান্ধীকে ভারতে নিয়ে আসা ও তার অহিংসার জল দিয়ে ভারতের বিপ্লবী আগুনকে নিভিয়ে দেবার এক পরিকল্পনা রচনা করে। তথা গান্ধীকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এক চক্রান্ত তৈরি করে। বৃটিশের পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি যে, গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ বৃটিশের পক্ষে বিন্দুমাত্র ক্ষতিকর হবে না। আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতের বৃটিশ সরকার মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বিশেষ করে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে খুবই ভীত হয়ে পড়েছিল এবং এই কারণেই তারা ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে নিয়ে যায়। অপরদিকে তারা গান্ধীর বক্তৃতা ও বিভিন্ন লেখার মধ্যে লক্ষ্য করল যে, গান্ধী যে কোন রকমের সহিংস আন্দোলনের বিরোধী।

পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজফফরপুরে বোমা দিয়ে আক্রমণ চালায়। গান্ধী তৎক্ষণাৎ তার নিন্দা করে লিখলেন, "They had no reason to rejoice at the introduction of Russian methods. They could neither achieve real Swaraj by following the path of evil, i.e. by killing British, nor by establishing factories" অর্থাৎ, তাদের এতে আনন্দ করার কিছু নেই, কারণ রাশিয়াকে নকল করা এই অশুভ পথ অনুসরণ করে প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। ইংরাজদের হত্যা করে এবং কারখানা স্থাপন করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত স্বরাজ আসবে না।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, গান্ধী তার অহিংস সত্যাগ্রহের তত্ত্ব বোঝাতে বলতেন, “A Satyagrahi should expect to get killed by an aggressor and not to kill him”—অর্থাৎ, এক জন সত্যাগ্রহী সব সময় আক্রমণকারীর দ্বারা নিহত হবার কামনা করবে, কিন্তু কাউকে হত্যা করার কামনা করবে না। কিন্তু এ ব্যাপারে হিন্দু শাস্ত্র কি বলে তা আমরা আগে দেখেছি। মনুসংহিতার (৮/৩৫০) শ্লোক বলছে যে, কোন আততায়ী, সে যদি গুরু, কিংবা বালক, কিংবা বৃদ্ধ হয়, অথবা ব্রাহ্মণ কিংবা অতিশয় বিদ্বান ব্যক্তিও হয়, তবুও সেই অগ্রসরমান আততায়ীকে কোন চিন্তা ভাবনা না করে তৎক্ষণাৎ হত্যা করতে হবে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের তত্ত্ব হিন্দুর শাস্ত্রীয় নির্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সেই সময় বাল গঙ্গাধর তিলক ক্ষুদিরামের বিপ্লবী কাজকে সমর্থন করে ৩ খানা প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই অপরাধে বৃটিশ সরকার তাঁকে ৬ বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে। অপরদিকে গান্ধী তিলকের কাজের নিন্দা করে তার ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকায় লিখলেন, “He (tilak) Aimed at inciting indians against British rule. The rulers are justified, from their point of view, in taking action against him........We submit that Mr. Tilak's view should be rejected”—অর্থাৎ, “তিলক ভারতীয়দের বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিয়েছেন। কাজেই শাসক হিসাবে বৃটিশ (তাঁকে জেলে পাঠিয়ে) উচিত কাজই করেছে।......আমাদের মতে, তিলকের দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করা উচিত।” এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিলক ছিলেন ভারতের নেতাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি দৃঢ়ভাবে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী সেই বৃটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য জীবন ব্যয় করেছেন। গান্ধী সগর্বে বলতেন যে, তার সত্যাগ্রহ শক্তি প্রয়োগের আন্দোলনের চাইতে হাজার গুণ শ্রেয় (কারণ তা ছিল বৃটিশ সরকারের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ)। হিংসাকে প্রশ্রয় দেন বলে তিনি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুরও নিন্দা করেন। তিনি বৃটিশ সরকারকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি কখনও হিংসার আশ্রয় নেবেন না।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে এই দেশের মানুষ দেখল শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গোখেল মুম্বাই থেকে জাহাজে করে প্রথমে লন্ডন গেলেন এবং ফেরার পথে দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে এলেন। শ্রী গোখেল ১৯১২ সালের ২২শে অক্টোবর কেপ টাউনে অবতরণ করলেন এবং গান্ধীকে ভারতে ফিরে আসার অনুরোধ জানালেন। আগেই বলা হয়েছে যে, সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ সরকার সেখানকার ভারতীয়দের ওপর বাৎসরিক ৩ পাউন্ড হিসাবে কর ধার্য করে। গান্ধী তখন ঐ অন্যায্য কর তুলে নেবার জন্য আন্দোলন করছিলেন। লন্ডনে থাকাকালীন শ্রী গোখেল বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন সাহেবের

সঙ্গে দেখা করেন এবং ঐ কর তুলে নিতে বলেন, যাতে গান্ধীর সুনাম হয়। শ্রী গোখেলের কথায় গ্ল্যাডস্টোন সেই কর তুলে নেন। আগেই বলা হয়েছে যে, গোখেলকে গান্ধী তার রাজনীতির গুরু বলে মানতেন। তাই গোখেল যখন গান্ধীকে বৃটিশের পরিকল্পনার কথা বললেন, গান্ধী তার কথায় রাজি হয়ে গেলেন এবং বৃটিশ প্রভুর ইচ্ছানুসারে বছরখানেক পরে ভারতে ফিরবেন বলে গোখেলকে জানালেন।

শ্রী গোখেল কেন গান্ধীকে ভারতে ফিরিয়ে আনার জন্য এত উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন? তারও যথেষ্ট কারণ ছিল। এটা সকলেরই জানা আছে যে, যে কয়েকজন বৃটিশের তাবেদারকে নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যাত্রা শুরু করেছিল, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও দাদাভাই নৌরজি ছিলেন তার অন্যতম। পরে লালা লাজপত রায়, বিপিন পাল ও তিলকের আগমনে কংগ্রেস নরম দল ও গরম দলে ভাগ হয়ে যায় এবং নরম দল তার কর্তৃত্ব হারায়। এই নরম দলের অন্যতম ছিলেন শ্রী গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও দাদাভাই নৌরজি। তারা বুঝতে পারলেন যে, গান্ধী ভারতে এসে কংগ্রেসে যোগ দিলে নরম দল শক্তিশালী হবে এবং গোখেল ও নৌরজির দল তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে।

যাই হোক, এর এক বছর নয় মাস পরে গান্ধী লন্ডন হয়ে ভারতে ফিরলেন। তিনি ১৯১৪ সালের ১৮ই জুলাই এস এস কিনফাউনস্ ক্যাসল্ (S.S. Kinfauns Castle) জাহাজে করে কেপ টাউন ত্যাগ করলেন। তার সঙ্গে চললেন স্ত্রী কস্তুরবা ও জার্মান বন্ধু কালেনবাখ (Kalenbuch)। ৬ই আগস্ট সেই জাহাজ লন্ডনে পৌছাল। প্রায় সাড়ে চার মাস লন্ডনে কাটাবার পর ১৯শে ডিসেম্বর তিনি ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ৯ই জানুয়ারী মুম্বাই বন্দরে পৌছান। ফেরার পথে লন্ডনে থাকাকালীন তিনি সত্যাগ্রহ পত্রিকায় লিখলেন, "I sailed for England to meet Gokhale on my way back to India, with mixed feelings of pleasure and regreat-pleasure because I was returning home after many years and eagerly looked forward serving the country under Gokhafe's guidance, regret because it was a great wrench for me to leave South Africa, where I have passed 21 years of my life sharing to the full in sweets and bitters of human experience, and where I have realized my vocation in life." অর্থাৎ, গোখেলের সঙ্গে লন্ডনে দেখা করার জন্যই আমি ভারতে ফেরার পথে, দুঃখ ও আনন্দের সঙ্গে, ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিলাম। আনন্দ হচ্ছিল কারণ এতদিন পরে দেশে ফিরব এবং দেশে ফিরে গোখেলের নেতৃত্বে দেশের সেবা করতে পারব। আর দুঃখ হচ্ছিল কারণ যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ২১ বছর কাটিয়েছি, যে ২১ বছরে নানা মধুর ও তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি, সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে।

এই সময় গান্ধী ভাবলেন যে, তিনি যদি গুজরাটী চাষীর পোষাক গ্রহণ করেন তবে ভারতবর্ষের মানুষের চোখে তা খুব ভাল লাগবে। তাই তিনি জাহাজের মধ্যে মাথায় এক বিশাল পাগরী সহ গুজরাটী চাষীর পোষাক পরে নেন এবং ঐ পোষাকেই জাহাজ থেকে নামেন। মুম্বাই বন্দরে অবতরণ করে সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করলেন তা হল, তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গভর্নরকে চিঠি লিখলেন যে, তিনি সদাসর্বদা তাঁর নির্দেশ মেনে চলবেন। অনেকের বিশ্বাস যে, ভারতে ফেরার পথে লন্ডনে তার মনিব ইংল্যান্ডের বৃটিশ সরকার তাকে যে শেষ নির্দেশ দিয়েছিল তা হল, তিনি ভবিষ্যতে কি করতে যাচ্ছেন তা ভারতের ভাইসরয়কে আগাম জানাতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তার অনুমতি নিতে হবে। এ ব্যাপারে এটাও সত্য যে, আমৃত্যু তিনি তার মনিবের সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন।

গান্ধীর অজ্ঞতা

আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধী তাঁর সারা জীবনে একটি মাত্র সার্টিফিকেট যোগার করতে পেরেছিলেন, আর তা হল ম্যাট্রিক পাশের সার্টিফিকেট। ১৮৮৭ সালে তিনি কোন মতে টেনে টুনে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করতে সক্ষম হন। মোট ৬২৫ নম্বরের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন ২৪৭ নম্বর। কাজেই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি, ইসলাম ইত্যাদি বিষয়ে তার কতটা জ্ঞান থাকা সম্ভব তা বুঝতে পাঠকের তেমন অসুবিধা হবার কথা নয়। এই স্বল্প জ্ঞানের জন্যই তিনি ১৯৩১ সালের ৩০শে এপ্রিলের "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকায় লিখলেন "Indian culture is therefore Indian. It is neither Hindu, Islamic or any other wholly. It is a fusion of all and essentially Eastern" অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতি শুধুমাত্র ভারতীয়। এটা পুরোপুরি হিন্দু, মুসলিম বা অন্য কিছু নয়। এটা সব কিছুর একটা একীভূত (জগাখিচুরি) রূপ, তবে প্রধানত প্রাচ্য। এ বিষয়ে ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তার হেডগেওয়ার, গুরুজী গোলওয়ালকর ইত্যাদি মণীষীরা সকলেই বলে গিয়েছেন যে, যাহা হিন্দু সংস্কৃতি, তাহাই ভারতীয় সংস্কৃতি। অর্থাৎ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি অভিন্ন। এমন কি, ১৯৯৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ হিন্দুত্বের ওপর যে ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে, তাতেও মাননীয় বিচারপতিগণ ঐ একই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে গান্ধীর মত একজন চূড়ান্ত অজ্ঞ ব্যক্তিকে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে বসালে দেশের কি অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। পাঠক এখানে এক রাজার প্রভুভক্ত বানরের গল্প

স্মরণ করতে পারেন। রাজা ঘুমাচ্ছিল আর প্রভুভক্ত বানরটি পাশেই বসেছিল। একটি মাছি উড়তে উড়তে রাজার মুখে বসছিল। বানর যত বার মাছিটাকে তাড়ায় সে তত বার রাজার মুখে বসে। বানরের তাতে রাগ হয়ে গেল, ভাবল বেয়াদপ মাছিটাকে সে মেরেই ফেলবে। সে একটা তরোয়াল হাতে নিয়ে বসে থাকল, মাছিটাকে সে তরোয়াল দিয়ে কেটেই ফেলবে। মাছি উড়তে উড়তে রাজার গলায় বসলো। বাঁদর মারল তলোয়ারের কোপ। মাছি উড়ে গেল আর রাজার ধর মুন্ড আলাদা হয়ে গেল। মূর্খ বাঁদর রাজাকে দু-খান করেছিল, আর মূর্খ গান্ধী ভারতকে কেটে দু-খান করে ফেলল।

ভারতের ইতিহাসের ব্যাপারে গান্ধীর কি জ্ঞান ছিল সে বিষয়ে তার একটি উক্তি তুলে ধরা উচিত হবে। ১৯২১ সালের ২৬শে জানুয়ারীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকায় তিনি লিখলেন "We were one nation before the English came. Many Hindus and Muslims have the same ancestors and the same blood. People should not become enemies because they change their religion" অর্থাৎ, বৃটিশরা এ দেশে আসার আগে আমরা সবাই এক জাতি ছিলাম। একই পূর্বপুরুষের রক্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। ধর্ম পরিবর্তন করলেই মানুয মানুষের শত্রু হবে, এটা কখনই উচিত নয়।

যে কেউ ইসলামের ব্যাপারে সামান্য পড়াশুনা করেছেন, তিনিই বলবেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদের একত্র বসবাস করা ও এক জাতি হয়ে যাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। কারণ ইসলাম বা কোরানের মূল কথাই হল, যারা মুসলমান নয় তারা হল ঘৃনিত কাফের এবং কোরানের নির্দেশ হল, কাফেরদের যেখানে পাও হত্যা কর, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন দাও, তাদের সহায় সম্পদ লুঠ কর, তাদের শিশুদের আছাড় দিয়ে মার, তাদের মেয়েদের বলাৎকার কর ইত্যাদি এবং এর নামই হল জিহাদ। একজন মুসলমানের পক্ষে জিহাদ হল সর্বাপেক্ষা পুণ্যের কাজ এবং এই কাজ যারা করবে, শেষ বিচারের দিন আল্লা সেইসব মুসলমানকে নানানভাবে পুরস্কৃত করবেন। যে মুসলমান কমপক্ষে একটাও কাফের কাটতে পারবে, আল্লা সেদিন তাকে গাজী উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবেন এবং সর্বোচ্চ স্বর্গ বা জান্নাত-ই-ফেরদৌস এ চিরকাল তার থাকার ব্যবস্থা করবেন। মুসলমানরা যতদিন এই নীতি নিয়ে চলবে, ততদিন তাদের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে বসবাস করা কোন অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "There are two religions on the earth, which have distincl enmity against all other religions. These two are Christianity and Islam. They are not satisfied with just observing their own religions, but are determined to destroy

all other religions. That's why the to make peace with them is to embrace their religion." অর্থাৎ এই পৃথিবীতে দুটো ধর্মমত আছে যাদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের প্রত্যক্ষ শত্রুতা বিদ্যমান। এই দুটোর নাম হল খৃষ্টমত ও ইসলাম। এরা শুধু নিজের ধর্ম আচরণ করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য সকল ধর্মের অবসান করতেও এরা বদ্ধ পরিকর। এদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করার মাত্র একটি রাস্তাই খোলা আছে, আর তা হল তাদের ধর্ম গ্রহণ করা। কাজেই, বৃটিশরা ভারতে আসার আগে এ দেশের হিন্দু ও মুসলমানরা এক পরিবারভুক্ত ভাইয়ের মত বসবাস করত, এই অলীক ও অবাস্তব তত্ত্ব গান্ধী কোথা থেকে পেলেন, তা এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

পক্ষান্তরে, বৃটিশ ভারতে আসার আগে মুসলমান শাসনের সময় ভারতের হিন্দুরা যে অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে শত শত বছর কাটিয়েছে, তা এক অকল্পনীয় ব্যাপার। এক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া তখন এক সাধারণ ব্যাপার ছিল। এক দিনের মধ্যে দুই লক্ষ হিন্দু কেটে তৈমুর লঙ যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিল। ফলে যমুনার জলস্রোত আটকে গিয়েছিল এবং মানুষের পচা গন্ধে সমস্ত অঞ্চল দূষিত হয়ে গিয়েছিল। এইসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "মুসলমানরা যখন এই দেশে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদের ঐতিহাসিকদের মতে এই ভারতবর্ষে ৬০ কোটি হিন্দুর অধিবসতি ছিল। এই গণনায় অত্যুক্তিদোষ না থাকিয়া বরং অনুক্তিদোষ আছে, কারণ মুসলমানদিগের অত্যাচারেই অনেক প্রজা ক্ষয় হইয়া যায়। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, হিন্দুর সংখ্যা ৬০ কোটিরও অধিক ছিল, কিছুতেই ন্যূন নয়। কিন্তু আজ (১৮৯৭-৯৮ সালে) সে হিন্দু ২০ কোটিতে পরিণত হইয়াছে।" স্বামীজীর উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৃটিশরা ভারতে আসায় হিন্দু মুসলমান কতখানি ভাই ভাই ছিল। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন যে, হিন্দুকে প্রতি নিয়ত বিনাশের আশঙ্কার মধ্যে শত শত বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছে।

ভারতের মুসলীম শাসন বর্ণনা করতে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক শ্রী উইল ডুরান্ট (Will Durant) লিখেছেন, "The Islamic Conquest of India is probably the bloodiest story in history." অর্থাৎ, মুসলমানদের ভারত বিজয় সম্ভবতঃ (মানব) ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রক্তাক্ত অধ্যায়। তিনি আরও লিখেছেন, "It is a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex of order and freedom, culture and peace, can at any moment be overthrown by barbarians invading from without or multiplying within."

সেই প্রায় ৮০০ বছর কাল স্থায়ী মুসলমান শাসনের আমলে হিন্দুকে কি লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, একটা উদাহরণ দিলে তা বুঝতে সুবিধা হবে। একদিন মুঘিসুদ্দিন নামে এক কাজি সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজসভায় আসে। আলাউদ্দিন তখন সেই কাজিকে জিজ্ঞাসা করল, "খরজ গৌজা (বা জিজিয়া প্রদানকারী) এবং 'খরজ সিংহ' (বশ্যতার নিদর্শক স্বরূপ কর প্রদানকারী)। হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে?" জবাবে মুঘিসুদ্দিন বলে, "তারা হল জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মী। জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিৎ হবে সসম্মানে ও বিনয়ের সাথে স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা বা ধুলো ছুঁড়ে মারে তবে তাদের উচিৎ হবে হা করে তা গিয়ে ফেলা। এইভাবেই তারা সেই করাদায়ককারীকে সম্মান দেখাবে। এইভাবে বিনয়ের সাথে কর দিয়ে এবং প্রতিবাদে নোংরা গিলে তারা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর মধ্য দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, "তাদের সর্বদা পরাধীন করে রাখো।" হিন্দুদের এইভাবে সদা সর্বদা হীন করে রাখাই আমাদের কর্তব্য, কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ নবী মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তাছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, "তাদের হত্যা কর, লুণ্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর।" তাদের দাসত্ব করতে বাধ্য কর। ইসলামে মহান টীকাকার হানিফার মত হল, "হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও" (অর্থাৎ তাদের জিম্মী হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে হিন্দুদের সামনে দুটো রাস্তা, হয় ইসলাম নয় মৃত্যু।" (জিয়াউদ্দিন বারনি, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী)। বিগত ৭০০/৮০০ বছরের মুসলমান পরাধীনতার আমলে হিন্দুরা কি বিরম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, উপরিউক্ত কথোপকথন তার একটি প্রমাণ্য দলিল। (অধিক জানতে হলে কৌতূহলী পাঠক এই লেখকের "মিথ্যার আবরণে দিল্লী আগ্রা ফতেপুর সিক্রি" দেখতে পারেন।)

কাজেই "বৃটিশরা এ দেশে আসার আগে আমরা সবাই এক জাতি ছিলাম। একই পূর্বপুরুষের রক্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছিল। ধর্ম পরিবর্তন করলেই মানুষ মানুষের শত্রু হবে, এটা কখনই উচিত নয়", এই উক্তির মধ্য দিয়ে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গান্ধীর যে পাহাড় প্রমাণ অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে তা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দেশ ও জাতির সঠিক ইতিহাস জানা অত্যন্ত আবশ্যক। কাজেই ইতিহাসের ব্যাপারে গান্ধীর মত একজন অকাট মূর্খ যে জাতিকে

বিপথে চালিত করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু এই মূর্খ গান্ধীই আবার চূড়ান্ত অহমিকার সঙ্গে বলতেন যে, তিনি এই ধরাধামে এসেছেন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। তাই সেই মূর্খের ইতিহাস পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

এছাড়া আরও বহু বিষয়ে গান্ধী ছিলেন একটি অকাট মূর্খ। বসন্তের টিকা দেওয়াকে গান্ধী পাপ বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের ঘৃণা করে যে পাপ করে তার ফলে ভূমিকম্প হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীর বিদ্যার দৌড় ছিল কোনমতে টেনেটুনে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ। কাজেই অর্থনীতির ব্যাপারে তার কতখানি জ্ঞান থাকা সম্ভব তা অনুমান করা কোন কঠিন কাজ নয়। অনেকের মতে, গান্ধীর অর্থনীতির জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল চরকা ও টলস্টয়ের "কিংডম অফ গর্ড"-এর মধ্যে। কথায় বলে, "দেবদূতেরা যেখানে ভয় পায়, মূর্খরা সেখানে এগিয়ে যায়।" তাই তার সেই সীমিত অর্থনীতির জ্ঞান নিয়েই গান্ধী অর্থনীতির ওপর ভাষণ দিতে যেতেন ও নাকাল হতেন। এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, বর্তমান ভারতের একটি অন্যতম রাজনৈতিক দল ঘোষণা করে চলেছে যে, তারা ভারতে গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে। হাস্যকর ব্যাপার হল, গান্ধী হয়তো নিজেও জানতেন না যে, গান্ধীবাদী সমাজতন্ত্র নামে তিনি একটি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন।

গান্ধীজী গীতার ওপর দু খানা রচনা লিখেছেন, অনাসক্তিযোগ ও গীতাবোধ। অনাসক্তিযোগ-এর ভূমিকায় তিনি লিখছেন, "সাধারণত মহাভারতকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মতে উহারা ধর্মগ্রন্থ মাত্র। তথাপিও তুমি যদি তাহাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে থাক তাহা হইলে আমি বলিব যে, তাহারা হইল আত্মার ইতিহাস। বিগত হাজার হাজার বৎসর পূর্বে কি ঘটিয়াছিল, সেই ইতিহাস উহাতে নাই। পক্ষান্তরে তোমার আমার অন্তঃকরণে প্রতিদিন যাহা ঘটিতেছে, উহাতে তাহাই বর্ণনা করা হইয়াছে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, 'গীতা-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান বিশুদ্ধ ও পবিত্র জ্ঞান, তবে কাল্পনিক। ইহার দ্বারা অবতার কৃষ্ণকে অস্বীকার করা হইতেছে না। শুধুমাত্র বলা হইতেছে সে তিনি কাল্পনিক।" উপরিউক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মহাভারত ও গীতা বিষয়ে গান্ধীর যে অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বলার কথা নয়।

সব থেকে বড় কথা হল, শ্রীকৃষ্ণকে কাল্পনিক বলার মধ্য দিয়ে গান্ধীর যে মূর্খতা প্রকাশ পেয়েছে, তা বলার কথা নয়। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে পরম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যখন মানবদেহ ধারণ করে পৃথিবীতে আসেন, তখনই তাকে অবতার বলে। সুতরাং, কৃষ্ণকে অবতার কিন্তু কাল্পনিক বলে গান্ধী যে মহা মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আর বলার

অপেক্ষা রাখে না। তাই ভারতের চরমতম দুর্ভাগ্য যে, বৃটিশ শাসকরা চক্রান্ত করে গান্ধীর মত এক মহা মূর্খকে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতার আসনে বসিয়েছিল এবং ক্ষমতা পেয়ে সেই মূর্খ যে সমস্ত কাজকর্ম করেছিল তার বিষময় ফল আজও ভারতের হিন্দুদের ভুগতে হচ্ছে।

গান্ধীর উপবাস ও কারাবরণ ঃ

১৯৩৩ সালের ৮ই মে গান্ধী ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, নিজেকে শুদ্ধ করাই এই উপবাসের লক্ষ্য। গান্ধী তখন জেলে ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যা ৬ টায় তাকে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ও রাত ৯টা নাগাদ তাকে লেডি থ্যাকারের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিয়ে যাওয়া হল, কারণ সেখানেই তিনি তার উপবাস শুরু করবেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, গান্ধী যখনই অন্য কোথাও বাস করতেন, তা লেডি থ্যাকারের প্রাসাদ, বা বিড়লাদের প্রাসাদ, বা আগা খাঁর প্রাসাদ হোক না কেন, তাকে পর্ণকুটীর বলা হত এবং খবরের কাগজেও তাই ছাপা হত।

যাই হোক, ১৩ই মে কস্তুরবা গান্ধীকেও মুক্ত করে দেওয়া হল এবং তাঁকে লেডি থ্যাকারের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেওয়া হল গান্ধীকে দেখাশুনা করার জন্য। সেই রাত্রেই তিনি কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি এম এস আনে-কে নির্দেশ দিলেন অসহযোগ সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিতে। শ্রী আনেও তার নির্দেশ মত অসহযোগ তুলে নেবার জন্য ঘোষণা জারি করলেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেন যে, বৃটিশের নির্দেশে যখনই কোন আন্দোলন তুলে নিতেন, তখনই তিনি নিজের শয়তানিকে চাপা দেবার জন্য বা দেশের মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য অনশন শুরু করতেন।

এই অবসরে গান্ধীর জেলে যাওয়া বা কারাবরণ করার ব্যাপারে কিছুটা আলোচনা করা উচিত হবে। গান্ধীর জেলে যাওয়া ছিল সরকারি জেলেই হোক কিংবা আগা খাঁ বা বিড়লাদের প্রাসাদেই হোক, অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে কিছুদিন বেরিয়ে আসা। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ১৯০৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তিনি প্রথম জেলে যান। তখন তিনি জেলে সকাল বেলায় গীতা ও বিকালে নিয়মিত কোরান পাঠ করতেন (Mahatma Gandhi, D Keer, P-125, 182-185, 185, 421-432)। ভারতে আসার পর ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ বৃটিশের পুলিশ আহমেদাবাদে তাকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ ছিল, ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি বৃটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন। বিচারে ৬ বছরের জেল হল। প্রথমে সবরমতী জেলে কিছুদিন কাটাবার

পর তাকে ইয়েরাব্দ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় জেলে তার খাদ্য তালিকায় ছিল, পাউরুটি, মাখন, ৩ পাউন্ড ছাগলের দুধ, ৪টি কমলালেবু, ২টি লেবু, ২ আউন্স রাইসিন, ১/২ পাউন্ড ময়দার চাপাটি, টেবল্ সল্ট ও বাইকার্বোনেড অফ সোডা (D Keer, ibid, p-529, 531)। কারাবরণের নামে এই তামাশার সময় গান্ধী যেখানেই থাকতেন, খবরের কাগজে তাকে পর্ণকুটির বলা হত (D Keer, ibid, p-722)।

গান্ধী ছিলেন পাশ্চাত্য চিকিৎসার বিরোধী, কারণ তিনি ইঞ্জেকশন দেওয়া ও অপারেশনকে হিংসা বলে মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত হবে যে, ১৯৪৬ সালে কস্তুরবার খুব ম্যালেরিয়া হয় এবং ডাক্তার তাঁকে পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন দেবার কথা বলে। সেই মত বৃটিশ সরকার তাঁর জন্য বিলেত থেকে বিমানে করে পেনিসিলিন নিয়ে আসে। কিন্তু গান্ধী হিংসার নাম করে তা প্রয়োগ করতে বাধা দেন। ফলে কস্তুরবার মৃত্যু হয়। কাজেই নির্দ্ধিধায় বলা চলে যে গান্ধী অহিংসার নামে নিজের স্ত্রী কস্তুরবাকে খুন করেছিলেন। অথচ ১৯২২ সালে কারাবাসের সময় জেলে গান্ধীর খুব আমাশা হয় এবং ডাক্তাররা নিয়মিত ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলে। এরপর গান্ধীর অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা হয় এবং ডাক্তাররা অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন করে তাকে সুস্থ করে। অথচ ভন্ড গান্ধী হিংসার নামে সেই চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোন বাধা দিলেন না। যাই হোক, এইভাবে ২ বছর জেলে কাটাবার পর তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। জেলে থাকাকালীন তিনি বৃটিশ কর্তাদের কাছে ২৪ খানা চিঠি লেখেন এবং সেইসব চিঠির মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকারের প্রতি তার অবিচল আনুগত্য প্রকাশ করেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি কারাবরণকে পুরস্কার বলে বর্ণনা করেন (D Keer, ibid, p-432)।

বৃটিশের দালাল গান্ধী জেলে যাবার নামে কি সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতেন তা সংক্ষেপে বলা হোল। বৃটিশের আর এক দালাল জহরলাল নেহেরুর জেলে ওই একই প্রকার সুখ সুবিধা পেতেন। কিন্তু একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক বৃটিশ সরকারের জেলে কি রকম দুঃখ কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করতে হোত তা সংক্ষেপে বলা সঙ্গত হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর যখন সেলুলার জেলে আটক ছিলেন তখন তাঁকে ঘানিতে সর্ষে ভেঙে প্রতিদিন দেড় সের (আজকের ১ কেজি ৩৫ গ্রাম) তেল বার করতে হোত। যদি তেল কম হোত তবে শাস্তি হিসাবে ২০ ঘা চাবুক মারা হোত। চামড়ার সেই চাবুক সব সময় তেলে ডোবানো থাকতো। ডাক্তার এসে আগে পরীক্ষা করতো, কত ঘা চাবুক তিনি সহ্য করতে পারবেন। তারপর উলঙ্গ করে, দুই হাত বেঁধে কড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে সেই চাবুক মারা হোত।

সম্প্রতি একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যে, গান্ধীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার না দিয়ে সুইডেনের নোবেল কমিটি গান্ধীর প্রতি অন্যায় করেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার

যে, ১৯৩৪ সালে আমেরিকার একটি পত্রিকা ক্রিশ্চিয়ান সেঞ্চুরি (Chiristian Century) সর্ব প্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য গান্ধীর নাম প্রস্তাব করে। নোবেল পুরস্কার তাকেই দেওয়া উচিত যার নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব আছে। একজন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দালাল সেই পুরস্কারের দাবিদার হতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, গান্ধীকে সেই পুরস্কার না দিয়ে নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কারের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

১৯২১ সালে জনৈক ব্যক্তি গান্ধীকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কি মনে করেন যে তিনি একজন মহাত্মা। জবাবে গান্ধী বলেন যে, তিনি মহাত্মা নন এবং মহাত্মা শব্দের সঠিক অর্থও তার জানা নেই। তা ছাড়া তিনি তার জীবনে অন্য একজন মহাত্মা ব্যক্তি দেখেননি, যাঁর সঙ্গে তিনি নিজেকে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

গান্ধীর বিচিত্র অহিংসা

আগেই বলা হয়েছে যে, গান্ধীর অহিংসার তত্ত্ব ছিল বিদেশ থেকে ধার করা এক বিচিত্র তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কথাই ছিল, শুধু ভারত এবং ভারতের হিন্দুরাই অহিংসা করবে। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালায়। গান্ধী আক্রান্ত হিন্দুদের অহিংসা করতে বলেন এবং আক্রমণকারী মুসলমানদের ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। ভারত কোনদিনও কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, সীমান্ত বা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতেও না। এই অহিংসার নীতিকে অনুসরণ করে হিন্দুরা কোন দিন সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে না। তার এই অহিংসা নীতির স্বার্থে তিনি সেনাহীন ও প্রতিরক্ষাহীন ভারতের পরামর্শ দেন। অথচ তিনি মুসলমানদের হিংসা ও বৃটিশ সরকারের হিংসাকে সমর্থন করতেন। ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালায়। গান্ধী আক্রন্ত হিন্দুদের অহিংসা করতে বলেন এবং আক্রমণকারী মুসলমানদের হিংসাকে সমর্থন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি জার্মানির বিরুদ্ধে বৃটিশকে অহিংস থাকার উপদেশ দেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেসের নেতারাও তার এই বিচিত্র অহিংসার নীতিকে পরিত্যাগ করেন।

গান্ধীর মুসলমান তোষণ

অনেকে মনে করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ১৯০৮ সালে গান্ধী তাঁর এই মুসলমান তোষণকারী বিচিত্র অহিংসার তত্ত্বকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করেন। ওই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ সরকার সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের ওপর বছরে ৩ পাউণ্ড অতিরিক্ত কর ধার্য করে এবং গান্ধী এ ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের

সঙ্গে বাক্যালাপ চালান। কিন্তু এই আলাপ আলোচনা মুসলমানদের মনঃপুত না হবার ফলে তারা কিছুটা রুষ্ট হয়। সেই সময় গান্ধী একটি সভায় হিন্দু ধর্ম, খ্রীস্টমত ও ইসলামের এক তুলনামূলক বক্তৃতা করেন। সেই বকতৃতার বিষয়বস্তু মুসলমানদের ক্রুদ্ধ করে তোলে।

এর কয়েক দিন পরে, ১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, কতিপয় মুসলমানের একটি দল মীর আলম নামে এক পাঠানের নেতৃত্বে গান্ধীর ওপর চড়াও হয়। মুসলমান আক্রমণকারীরা গান্ধীকে যথেচ্ছ কিল, চড়, ঘুষি মারে এবং মাটিতে ফেলে লাঠি পেটা করে। মাটিতে পড়ে গেলে তারা গান্ধীকে লাঠি দিয়ে পেটায় এবং যাবার সময় প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ডঃ বি আর আম্বেদকরের মতে, এই ঘটনার পর গান্ধী ইসলাম তথা মুসলমানদের কোন রকমের সমালোচনা করা বন্ধ করে দেন। এবং এই ঘটনাকে তিনি গান্ধীর জীবনের একটি মাইলস্টোন বলে বর্ননা করেন। ডঃ আম্বেদকরের মতে গান্ধী ছিলেন শক্তের ভক্ত নরমের যম এবং এই ঘটনার পর থেকেই তিনি মুসলমানদের অত্যন্ত গর্হিত অপরাধকেও আর অপরাধ বলে মনে করতেন না।

একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। ১৯২৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আব্দুল রসিদ নামে এক মুসলমান আততায়ী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিলেন। এটা হয়তো অনেকেরই জানা আছে যে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ছিলেন আর্য সমাজ-এর এক জন প্রচারক এবং তিনি ধর্মান্তরিত ভারতীয় মুসলমানদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি শুদ্ধিযজ্ঞ চালু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। এই ঘটনার মাস দুয়েক আগে একজন মুসলমান মহিলা সন্তান সন্ততি নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয় এবং তাদের জন্য শুদ্ধিযজ্ঞ করে তাদের হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনতে বলেন। কিন্তু মহিলাটির স্বামী আদালতে মামলা করে স্বামীজির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে যে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ওই মহিলাকে অপহরণ করেছেন। কিন্তু আদালত ওই অভিযোগ খারিজ করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সসম্মানে মুক্তি দেয়। এর ফলে মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আব্দুল রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন পরেই গৌহাটিতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের এই করুণ পরিণতির জন্য পুরিবেশ ছিল খুবই শোকাহত ও স্তব্ধ। কিন্তু গান্ধী বক্তৃতা করতে উঠেই সেই আততায়ী ও খুনী আব্দুল রসিদকে 'ভাই আব্দুল রসিদ' বলে সম্বোধন করলেন। তাঁর এই আচরণে অন্যান্য নেতারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু গান্ধী সে সব তোয়াক্কা না করে বলতে থাকলেন, 'এখন

হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কেন আমি আব্দুল রসিদকে 'ভাই আব্দুল' রসিদ বলেছি। এবং আমি বার বার ঐ একই কথা বলবো। আমি এ কথাও বলবো না যে, আব্দুল রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে খুন করার অপরাধে অপরাধী। প্রকৃত অপরাধি হল তারা, যারা একের মনে অন্যের প্রতি ঘৃণার মনোভাব জাগিয়ে তোলে।' অর্থাৎ প্রকারান্তরে গান্ধী স্বামী শ্রদ্ধানন্দকেই তাঁর মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করলেন। কারণ তিনি তাঁর শুদ্ধিযজ্ঞের মাধ্যমে ঘৃণা প্রচার করছিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শোকবার্তায় গান্ধী লিখলেন, "স্বামী শ্রদধানন্দ সম্পর্কে আমি একটি কথাই বলবো যে, তিনি বীরের জীবন যাপন করেছেন এবং বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন।" অর্থাৎ, কোন মুসলমানদের হাতে কোন হিন্দু খুন হলে হিন্দুদের উচিৎ সেই মৃত্যুকে বীরের মত মৃত্যুবরণ বলে মনে করা।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, মুসলমান তোষণ করার এই গান্ধীবাদী অহিংসা তথা মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিই দেশবিভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম দিয়েছে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, গান্ধী দেশভাগের বিরোধী ছিলেন। অথবা গান্ধী দেশভাগের অপরাধে অপরাধী নন। এই বিশ্বাসের কারণ হল, গান্ধী প্রকাশ্য সভায় সব সময় বলতেন, "দেশ দ্বিখণ্ডিত করার আগে আমাকে দ্বিখণ্ডিত কর"। (Vivisect me, before you vivisect india) যখন প্রকাশ্য সভায় তিনি ওই সব কথা বলছিলেন, ঠিক একই সময় তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করছিলেন। পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, ১৯৪০ সালের ২৬শে মার্চের বৈঠকে মুসলীম লিগের নেতারা সর্বপ্রথম দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে। তাদের সেই দাবিকে সমর্থন করে গান্ধী দিন দশেক পড়ে, ৬ই এপ্রিলের "হরিজন" পত্রিকায় লিখলেন, "দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা একটা যৌথ পরিবারের মতই বসবাস করছি। তাই এর কোন এক শরিক ভিন্ন হতে চাইতেই পারে।" এর বছর দুই বাদে, ১৯৪২ সালের ১৮ই এপ্রিলের "হরিজন" পত্রিকায় তিনি আবার লিখলেন, "যদি ভারতের বেশিরভাগ মুসলমান এই মত পোষণ করে যে মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি, যাদের সঙ্গে হিন্দু ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর কোন মিল নেই, তবে পৃথিবীর এমন শক্তি নেই যে সেই চিন্তা ভাবনা থেকে তাদের বিরত করতে পারে এবং সেই ভিত্তিতে তারা যদি বেশীরভাগ চায় তবে অবশ্যই দেশভাগ করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করতে পারে।"

এ ব্যাপারে পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার ১৯৪৭ সালের ১২ই জুনের বৈঠকে দেশবিভাগের প্রস্তাব আনে এবং পরবর্তী ১৪ই ও ১৫ই

জুনের বৈঠকে "অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি" সেই প্রস্তাব অনুমোদন করে। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, উপরিউক্ত ১৪ ই জুনের বৈঠকে কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট নেতা, যেমন পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, চৈতরাম গিদোয়ানী, ডঃ এস কিচলু প্রভৃতি, দেশভগের প্রস্তাবকে প্রবলভাবে বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর গান্ধী ওই সব নেতাদের থামিয়ে দিয়ে দেশভাগের সপক্ষে ৪৫ মিনিট ধরে এক জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, কংগ্রেস দেশভাগ মেনে না নিলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেবে এবং দেশের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি অর্থাৎ দলের হাতে চলে যাবে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের খুশী করা এবং কংগ্রেস দেশভাগের প্রস্তাব মেনে না নিলে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করতে মুসলমানদের উস্কানি দেওয়া। দেশভাগের ব্যাপারে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল তখন ও ছিলেন দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু গান্ধীর ৪৫ মিনিটের বক্তৃতায় তিনি এতটাই মোহিত হয়ে পড়লেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি দেশবিভগের প্রবল সমর্থক হয়ে পড়লেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্থ নেতারাও দেশভাগের সপক্ষে রায় দিলেন। ফলে দেশভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল (History of Freedom Movement in India, R C Majumdar, Vol-III, p-670)।

অহিংসা ও সেকুলারবাদের আড়ালে গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতি শুধু দেশভাগ করেই ক্ষান্ত থেকেছে তাই নয়। ওই নীতি স্বাধীনতার পরেও দেশের সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং এই ২৩ শতাংশ মুসলমান দেশের ৩২ শতাংশ জমি পৃথক করে পাকিস্তান হিসবে পেয়েছিল। কাজেই সেই সময় সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ ছিল বিভক্ত ভারতের সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুকে ভারতে নিয়ে আসা। কিন্তু গান্ধী এই গণ-বিনিময় বা Population exchange-এর প্রবল বিরোধিতা করে বললেন যে, এটা এক অলীক ও অবাস্তব প্রস্তাব।

তৎকালীন বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনও ওই গণ-বিনিময়ের সমর্থক ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে সেই কাজ সমাধা করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নেহেরুও এ ব্যাপারে আর উচ্চবাচ্য করলেন ন। কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করলে সেই সময় গণ-বিনিময় অত্যন্ত জরুরী ছিল এবং তা হলেও আজকের বহু সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতির ফলে মুসলমানরা বহাল তবিয়তে এদেশেই থেকে গেল, কিন্তু হিন্দুদের সবকিছু হরিয়ে উদ্বাস্তু হিসাবে পকিস্তান থেকে চলে আসতে হল।

এটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই যে, গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হতে পারেনি। এক কালে গান্ধী বন্দেমাতরম গানের ভক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন ১৯০৫ সলের ২রা ডিসেম্বরের "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকায় গান্ধী লিখলেন, "এর (অর্থাৎ বন্দেমাতরম) আবেদন খুবই মহৎ এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় তা শুনতেও অনেক সুমধুর। অনেক দেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে অন্যান্য দেশের প্রতি কটাক্ষ করা হয় এবং নিন্দাসূচক বাক্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বন্দেমাতরম সেই সব দোষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা।" কিন্তু পরবর্তীকালে যেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, মুসলমানরা গানটি পছন্দ করে না, তৎক্ষণাৎ তিনি বন্দেমাতরম গাওয়া বা আবৃত্তি করা যেখানে পারলেন বন্ধ করে দিলেন। এর ফলশ্রুতি হিসবেই স্বাধীনতার পর জহরলাল নেহেরুর প্রচেষ্টায় "জন গণ মন" জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হল। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লি-তে বিতর্কের সময় নেহেরু যুক্তি দেখালেন যে, সামরিক বহিনীর বাজনার সঙ্গে বন্দেমাতরমের সুর মিল খায় না, কিন্তু জন গণ মন-র বেলায় সেই অসুবিধা নেই।

এ প্রসঙ্গে এটাও বলে রাখা দরকার যে, যেই তিরঙ্গা পতাকা আজ জাতীয় পতাকার মর্যাদা পেয়েছে, সেই পতাকাও গান্ধীর অপছন্দ ছিল। কারণ ওই পতাকা মুসলমানরা পছন্দ করতো না। এ ব্যাপারে শ্রী নাথুরাম গড্‌সে তাঁর "Why I Assassinated Gandhi" গ্রন্থে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রী গড্‌সে লিখেছেন, "১৯৪৬ সালে কলকতা ও নোয়াখালিতে হিন্দুদের গণহত্যার ঠিক পরে গান্ধী যখন নোয়াখালি ও ত্রিপুরা ভ্রমণ করছিলেন, তখন নোয়াখালিতে তাঁর সাময়িক বাসগৃহের মাথায় স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীরা তিরঙ্গা পতাকা লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু যেই মাত্র এক জন সামান্য পথচারী মুসলমান গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে ওই পতাকার ব্যাপারে আপত্তি জানাল, গান্ধী তৎক্ষণাৎ তা নমিয়ে দেবার হুকুম দিলেন। লক্ষ লক্ষ কংগ্রেস কর্মীর শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দু যে পতাকা সেই পতাকাকে এক মনিটের মধ্যে গান্ধী অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন, কারণ একজন অশিক্ষিত গোঁড়া গ্রাম্য মুসলমান তাতে খুশি হবে।" (পৃষ্ঠা- ৭৫-৭৬)।

এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। প্রথম দিকে গন্ধী হিন্দী ভাষার খুব ভক্ত ছিলেন এবং বলতেন যে, হিন্দী ভাষাই সর্বভারতীয় হবার উপযুক্ত। কিন্তু পরে মুসলমানদের খুশি করার জন্য হিন্দুস্থানী নামের আড়ালে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য দাবি করতে থাকেন (Koenrad Elst, Gandhi and Godse, Voice of India, P-89)।

দেশ ভাগের কয়েক মাস আগে যখন পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব-পাঞ্জবে ও দিল্লীতে আসতে শুরু করলো, তখন গান্ধী সেই সব বিপন্ন হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বলল, "Hindus should never be angry against the Muslims even if the latter might make up their minds to undo their (Hindus) existence. If they put all of us to the sword, we should court death bravly. We are destined to be born and die, then why need we feel gloomy over it?"—অর্থাৎ, "মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলে, তবুও হিন্দুদের কখনোই উচিত হবে না মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা। যদি তারা আমাদের সবাইকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলে, তবে আমাদের উচিত হবে বীরের মত সেই মৃত্যুকে বরণ করা। ...আমাদের জন্ম-মৃত্যু তো ভাগ্যের লিখন, তাই এই ব্যাপারে এত মন খারাপের কি আছে?" (১৯৪৭ সলের ৬ই এপ্রিল তারিখের ভাষণ)।

এ ব্যাপারে তিনি আরও বললেন, "The few gentlemen from Rawalpindi who called upon me, asked me, "What about those who still remain in Pakistan?" I asked, why they all came here (Delhi)? Why they did not die there? I still hold on to the belief that we should stick to the place where we happen to live, even if we are cruelly treated, and even killed. Let us die if the people kill us, but we should die bravely with the name of God on our tounge."—অর্থাৎ, "রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যে সব লোকেরা পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল, যে সমস্ত লোক (হিন্দু) এখনও পাকিস্তানে পড়ে রয়েছে তাদের কি হবে? আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, তোমরা কেন এখানে (দিল্লীতে) চলে এসেছ? কেন তোমরা সেখানে মরে গেলে না? আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, আমরা যেখানে বসবাস করছি, সে স্থান আমাদের কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। এমন কি সেখানকার লোকেদের কাছ্‌ থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলে বা মৃত্যু নিশ্চিৎ হলেও না। যদি সেই লোকেরা আমাদের হত্যা করে, তবে যাও, মুখে ভগবানের নাম নিতে নিতে তদের হাতে বীরের মৃত্যু বরণ কর।" "Even if our men are killed, why should we feel angry with anybody? You should realize that even if they are killed, they have had a good and proper end."—অর্থাৎ, "যদি আমাদের লোকেদের (হিন্দুদের) হত্যা করা হয়, তবে কেন আমরা অন্য কারও ওপর ক্রুদ্ধ হব? যদি তদের হত্যা করা হয় তবে তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে, তারা আকাঙ্ক্ষিত উত্তম গতিই লাভ করেছে।" (১৯৪৭ সালের ২৩শে নভেম্বরে প্রদত্ত ভাষণ)।

গান্ধী এ ব্যাপারে আরও বললেন, "If those have killed have died bravely, they have not lost anything but earned something. ...They should not be afraid of death. Aftr all, the killers will be none other than our Muslim brothers." —অর্থাৎ, যদের হত্যা করা হয়েছে, তারা যদি সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে থাকে, তবে তারা কিছুই হারায়নি, বরং কিছু অর্জন করেছে। ...মৃত্যুর জন্য তাদের ভীত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে, যারা হত্যা করেছে তারা তো আমাদেরই ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। তারা আমাদেরই মুসলমান ভাই।" (Shri Nathuram Godse, Why I Assassinated Gandhi, p-92-93; as quoted by koenrad ELst in Gandhi and Godse, Voice of India, p-121)

এ প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলে আসা কয়েকজন উদ্বাস্তু হিন্দু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে গান্ধী আবার তাদের পাকিস্তানে ফিরে যাবার উপদেশ দেন। যদিও তাদের ফিরে যাবার অর্থ ছিল নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি তাদের বলেন, "If all the Punjabis were to die to the last man without killing (a single Muslim), Punjab will be immortal. Offer yourselves as nonviolent willing sacrifices."—অর্থাৎ, "(একটি মুসলমানকেও) হত্যা না করে, শেষ মানুষটি পর্যন্ত সমস্ত পাঞ্জাবী (হিন্দু) যদি মৃত্যু বরণ করে, তবে পাঞ্জাব অমর হবে। তোমরা যাও, এবং অহিংসার স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত বলি হও।" (Collins and Lapierre, Freedom at Midnight, p-385) গান্ধীর এই সমস্ত কথাবার্তা পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে তাকে "মহাত্মা" আখ্যায় ভূষিত করা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবং আজও তাকে "জাতির জনক" এবং "মহাত্মা" হিসবে মথায় করে রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত হচ্ছে।

গান্ধী মতে মুসলমানরা হল হিন্দুর ভাই। তাই কোন হিন্দুর উচিত নয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বা যুদ্ধ করা। তিনি আরও বলতেন যে, স্বাধীন ভারতের বিদেশ-নীতি এমন হবে যে, সেই নীতি সব সময় ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। সেই ভারত আরব বা তুরস্কের মত কোন মুসলমান দেশকে কখনোই আক্রমণ করবে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে তিনি রাণা প্রতাপ, গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাজা রণজিৎ সিংহ ও রাজা শিবাজীর নিন্দা করেন এবং বলেন, "They were misguided patriots", বা তাঁরা ছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট দেশপ্রেমিক। গান্ধী মনে করতেন যে, তিনিই একমাত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, আর বাকি সকলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট। এবং তার বিচারে জর্জ ওয়াশিংটন, গ্যারিবল্ডি, কামাল পাশা, ডি ভ্যালেরা, লেনিন ইত্যাদি সকলেই ছিলেন লক্ষ্যভ্রষ্ট (Young India - April 9, 1925). কারণ এঁরা সকলেই হিংসায় উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তার এই সব মন্তব্যের ফলে অনেক বিপদ দেখা দিল। দেশের নমস্য এই সব হিন্দু বীরদের লক্ষ্যভ্রষ্ট বলার ফলে অনেক হিন্দুর মনে গান্ধীর প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হল। বিশেষ করে রাজা শিবাজীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বলার ফলে মারাঠীদের মধ্যে মহা অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হল তাঁরা গান্ধীর ওপর বেজায় ক্ষেপে যান। পরে জহরলাল নেহেরুকে গান্ধীর হয়ে ক্ষমা চাইতে হয়। ফলে তাঁদের অসন্তোষ কিছুটা হ্রাস পায়।

মুসলমনরা যখন হিন্দু বা অন্য কোন কাফের জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা চালায়, তখন মারদাঙ্গা, হত্যা, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির সাথে সাথে অবশ্য কর্তব্য হিসবে হিন্দু বা কাফের রমণীদের ওপর বলাৎকারও করে থাকে। আল্লার আদেশ, তথা কোরানের নির্দেশ অনুসরেই তারা যে এই সমস্ত পাশবিক কাজ করে থাকে তা বলাই বাহুল্য। ভারতে মুসলমান শাসনের আমলে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু নারী ধর্ষণ এক ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। লম্পট মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার বা মান-সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করর জন্যই তখন হিন্দু রমণীরা দলে দলে জ্বলন্ত আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে সতী হতেন।

দেশ বিভাগের আগে এবং পরে পকিস্তানের হিন্দুদেরে ওপর মুসলমানরা যে হামলা চালায়, হিন্দু নারী ধর্ষণ তার একটা আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে যে হিন্দু নিধন যজ্ঞ হয়, তখনও হাজার হাজার হিন্দু রমণী ধর্ষিতা হন। অনেকেরেই হয়তো জানা নেই যে, মুসলমানদের এই জঘন্য কাজের ব্যাপারে গান্ধী কি মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯২৬ সালের ৬ই জুলাইয়ের নবজীবন পত্রিকায় তিনি লিখলেন যে, **কোন মুসলমান তার ঘরে ঢুকে তার বোনকে ধর্ষণ করলে তিনি তার বোনের সতীত্ব নষ্টকারী সেই মুসলমানের পায়ে চুমু খাবেন।** (Mahatma Gandhi, D Keer, Popular Prakashan, p-473). স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন পাঞ্জবের মহিলারা মুসলমানদের দ্বারা ধর্ষিতা হচ্ছিল, তখন গান্ধী তাদের পরামর্শ দিলেন যে, **কোন মুসলমান কোন মহিলাকে ধর্ষণ করতে চাইলে তারা কখনোই সেই মুসলমানকে বাধা দেবে না, বরং তার সাথে সহযোগিতা করবে। সেই মহিলার তখন উচিত হবে দুই দাঁতের মধ্যে জিভ কামড়ে মরার মত শুয়ে থাকা।** (D lapierre L Collins, Freedom at Midnight, Vikas, p-479)।

উপরিউক্ত সমস্ত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দুর দুঃখে গান্ধীর মন সামান্য পরিমাণেও বিচলিত হত না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের জন্য তার প্রাণ সর্বদাই কাঁদত। তার হিন্দু মুসলমানের মিলনের তত্ত্ব ছিল সম্পূর্ণ একদেশদর্শী। এ জন্য হিন্দুরাই সমস্ত রকম ত্যাগ স্বীকার করবে, মুসলমানদের সমস্ত দুষ্কর্ম, অত্যন্ত গর্হিত অপরাধও হিন্দুরা মুখ বুজে সহ্য করবে। এটাই হল গান্ধীবাদী অহিংসা তথা সেকুলারবাদের মূল কথা।

এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, গান্ধী কোন দিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেননি। তার লক্ষ্য ছিল স্বরাজ নামের এক উদ্ভট বস্তু। তিনি বলতেন যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের কোন প্রয়োজন নেই। বরং স্বরাজের জন্যই বৃটিশ শাসন টিকিয়ে রাখতে হবে এবং বৃটিশ শাসনের মধ্যে থেকেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অর্থাৎ, স্বরাজের অর্থ বৃটিশ শাসনের অবসান নয়। তাই তিনি সব সময় স্বাধীনতার বিরোধিতা করতেন এবং নেতাজী ও পরবর্তী কালে অন্যান্য নেতারা স্বাধীনতার দাবি তুললে তিনি তাদের তিরস্কার করতেন। তার এই উদ্ভট স্বরাজের মূল শর্তই ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন। তিনি বলতেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন ছাড়া স্বরাজ সম্ভব নয়। আর গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মূল কথা ছিল, হিন্দুদের যা কিছু আছে তার সবকিছু মুসলমানকে দিয়ে দিতে হবে। মুসলমানদের খুশি করতে গান্ধী এক সময় সৈয়দ আমির আলির লেখা স্পিরিট অফ ইসলাম ও স্যর উইলিয়াম মুরের লেখা লাইফ অফ মেহমদ অনুবাদ করতে মনস্থ করেন। মুসলমানদের খুশি করতে তিনি তাদের অত্যন্ত গুরুতর অপরাধও না দেখার ভান করতেন এবং তাদের আল্লাহু আকবর ধ্বনিকে জাতীয় স্লোগান বলতেন। অনেকের চোখে গান্ধী ছিলেন জিন্নার থেকেও বেশি মুসলমান।

অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে, তিনি বলতেন যে, আফগানিস্তানের আমিরের উচিত হবে না ভারতের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। ভারতের মুসলমানদের তিনি উপদেশ দিতেন যে, আফগানিস্তানের আমির ভারত আক্রমণ করলে তাদের উচিত হবে ঐ আমিরের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তিনি সব সময় বলতেন যে, মুসলমানরা হল বীর আর হিন্দুরা হল কাপুরুষ। তিনি মুসলমানদের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করতে উত্তেজিত করতেন এবং মুসলমানদের আরও হিংস্র হতে বলতেন। অপর দিকে তিনি হিন্দুদের অহিংস থাকতে বলতেন এবং মুসলমানরা আক্রমণ করলে তা প্রতিরোধ করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন যে, হিন্দুরা যদি মরেও যায় তবুও কোন মুসলমানকে তারা আঘাত করবে না। স্বাধীনতার প্রাক্কালে মুসলমানরা যখন পাঞ্জাবে ব্যাপক দাঙ্গা শুরু করে ও হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে, তখন সর্দার প্যাটেল হিন্দুদের নিজের প্রাণ রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেন এবং গান্ধী এ জন্য প্যাটেলকে তিরস্কার করেন। ১৯৪৬ সলে নোয়াখালীতে যখন হিন্দু নিধন হচ্ছিল তখন গান্ধী সেখানে গেলেন না। দাঙ্গা বন্ধ হয়ে যাবার পরে তিনি সেখানে ভ্রমণ করতে গেলেন। কিন্তু নোয়াখালীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিহারে যখন দাঙ্গা শুরু হল, তখন তিনি মুসলমানদের বাঁচাতে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটলেন। তার এই মুসলমান প্রীতির জন্য অনেকে তাকে মহম্মদ গান্ধী বলত। তিনি হিন্দুদের ব্যায়াম ও শরীর চর্চা করতে নিষেধ করতেন কারণ হিন্দুরা শক্তিশালী

হলে মুসলমানদের অসুবিধা হবে। সত্যি সত্যি তিনি গুজরাটে হিন্দুদের সমস্ত ব্যায়াম চর্চার কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেন।

তিনি মনে করতেন যে, ইংরেজ শাসনের থেকে মুসলিম শাসন ভাল। তাই স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি ভারতের শাসন মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে তিনি বৃটিশকে অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারত শাসন করার জন্য একজন মুসলমান সম্রাটের খোঁজ খবর শুরু করেন। কিন্তু মুসলমানদের জন্য এত করেও তিনি তাদের চোখে একজন ঘৃণ্য কাফের হয়েই থাকলেন। কারণ কোরান হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বলে না। তাই মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি বললেন যে, একজন মুসলমান হিসাবে আমি বলতে বাধ্য যে, গান্ধী একজন অধঃপতিত মুসলমানের থেকেও হীন।

দেশভাগের ব্যাপারে গান্ধীর বিশ্বাসঘাতকার কথা আগেই বলা হয়েছে। দেশভাগের পর গান্ধী ও জহরলাল নেহেরু উঠে পড়ে লাগলেন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু চিহ্ন ও হিন্দু ঐতিহ্য মুখে ফেলতে। প্রথমে তারা হিন্দুস্থান নামের বিরোধিতা করলেন। তারপর ভারতকে অ-প্যাকিস্তান বলতে শুরু করলেন। শেষে নাম রাখলেন ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিক। অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের নামই সংখ্যাগুরু লোকদের নামেই পরিচিত হয়ে থাকে, যেমন ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, জাপান, তুরস্ক, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ইত্যাদি।

গান্ধী ও তার মুসলমান তোষণকারী অহিংসার তত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এক সময় বলেছিলেন, "India will be free to the extent it succeeds in shaking off the spell of Gandhism"—অর্থাৎ, "ভারতবর্ষ ততখানিই স্বাধীন হবে, গান্ধীবাদের যাদুকে সে যতখানি ঝেড়ে ফেলতে পারবে।"

মোপলাদের ঘটনা

বৃটিশ আমলে আজকের কেরালা রাজ্যের নাম ছিল ত্রিবাঙ্কুর এবং তা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। মালাবার ছিল এই ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একটি ছোট জেলা, যার লোক সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ। এই জেলায় বসবাসকারী মুসলমানদের মোপলা বলা হোত এবং এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ। ঐতিহাসিকদের অনুমান যে, এক কালে আরবের বণিক, নাবিক ও মাঝিমল্লাদের কিছু লোক এই মালাবার জেলায় বসবাস করতে শুরু করে এবং তারা স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে এই মোপলা জনগোষ্ঠী গড়ে তোলে। অনেকের মতে মোপলা শব্দটি মোল্লা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই মোপলারা ছিল অতিশয় দরিদ্র এবং তারা প্রায় সকলেই নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত খামারে দিনমজুরের কাজ করত। চরিত্রের দিক দিয়ে এরা ছিল খুবই হিংস্র এবং কারণে

অকারণে এরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করত ও আক্রমণ চালাত। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে এরা ৩৫ বার হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়।

১৯২১ সালের আগস্ট মাসে, গান্ধী যখন অসম, শ্রীহট্ট, শিলচর ইত্যাদি স্থানে ভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় মোপলারা আবার হিন্দুদের ওপর হামলা চালায়। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে তারা বিনা প্ররোচনায় নিরীহ হিন্দুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা, রক্তপাত, লুট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ, মন্দির অপবিত্রকরণ ইত্যাদি আসুরিক কাজকর্ম অবাধে চলতে থাকে। এই আক্রমণের নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, বীভৎসতা ও ব্যাপকতা ছিল অকল্পনীয়। হিন্দুদের সামনে তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম গ্রহণ নয় মৃত্যু।

এই আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছিল অলি মুসালিয়ার নামে এক জল্লাদ। আক্রমণ বন্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার সামরিক আইন জারি করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর, এই ৫ মাস ধরে তা চলতে থাকে। ফলে সরকারকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ রাখতে হয়। সরকারি হিসাব অনুসারে ২৩০০ হিন্দু মার যায় এবং ১৬৫০ হিন্দু আহত হয়। যদিও বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা ছিল এর দ্বিগুণেরও বেশি।

গান্ধী বহু ক্ষেত্রে বলপূর্বক ধর্মান্তরণকে ভয়ঙ্কর কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মোপলাদের বেলায় তিনি আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থেকেছেন। উপরন্তু তিনি তার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় এই মিথ্যা প্রচার করেছেন যে, মোপলাদের আক্রমণের সময় মাত্র একটি ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটেছিল। সব থেকে লজ্জার কথা হল, মোপলাদের নিরীহ হিন্দু হত্যাকে তিনি বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মোপলারা হল বীর (bullies) আর হিন্দুরা হল কাপুরুষ (Cowards)। মোপলদের দোষ ঢাকার জন্য গান্ধী বলতেন যে, এর জন্য হিন্দুরাই দায়ি। তারাই মোপলাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তাই তারা বাধ্য হয়ে হিন্দুদের হত্যা করেছে। উপরন্তু তিনি মানবিকতার দোহাই দিয়ে হিন্দুদের প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টাকে দমিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই যে, মোপলাদের এই ভাবে নৈতিক সমর্থন দিয়ে তাদের রক্ষা করার ফলেই পরবর্তীকালে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের মুসলমানরা হিন্দুদের ওপর দাঙ্গা করতে উৎসাহিত হয়েছিল।

আরও লজ্জার কথা হল, মোপলাদের এই জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে গান্ধী তার নিন্দা করেছেন। বৃটিশের সঙ্গে দাঙ্গাকারী মোপলাদের সংঘর্ষকে তিনি মোপলাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছেন এবং

বলেছেন, "মোপলারা হল ভারতের অন্যতম এক সাহসী জাতি। তারা ঈশ্বরভীরু এবং তারা যে সাহসিকতা দেখিয়েছে সে জন্য তাদের সেনা পুরস্কার দেওয়া উচিত" (D Keer, ibid, p-402)। গান্ধীর এই মুসলমান তোষণকারী মিথ্যা প্রচারের ফলেই যে সব মোপলা দস্যু তখন পুলিশের গুলিতে মারা যায়, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ আখ্যা দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার পর অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর মত তাদেরও সরকারি ভাতা দেওয়া হয়। সেই ধারা অনুসরণ করে আজও মুম্বাই-এর সেকুলার ও কমিউনিস্ট রাজনীতিকরা প্রতি বছর মোপলা দিবস পালন করে এবং মিটিং মিছিল করে।

তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধী বেঁচে থাকলে আজ মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা কাশ্মীরের নিরীহ হিন্দু হত্যা, তাদের হিন্দু মন্দির আক্রমণ ও নিরীহ ভক্তদের হত্যা এবং অমরনাথযাত্রীদের হত্যাকে তিনি মুসলমানদের বীরত্বের কাজ বলে বর্ণনা করতেন এবং আক্রান্ত হিন্দুদের কাপুরুষ আখ্যা দিতেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর সেই মুসলমান তোষণের নীতিকে অনুসরণ করেই আজকের সেকুলার রাজনীতিক ও সেকুলার সংবাদ মাধ্যমগুলো গোধরার হিন্দু হত্যাকারী মুসলমানদের দোষ ঢাকতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, গান্ধীর অত্যন্ত হীন ও গর্হিত মুসলমান তোষণের নীতি অনুসরণ করেই তারা হিন্দুদের দোষী সাব্যস্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। সেই সময় গান্ধী, আক্রান্ত হিন্দুদের জন্য নয়, আক্রমণকারী মুসলমানদের জন্য চাঁদা তুলে তহবিল তৈরি করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, গান্ধীর সেই ধারা অনুসরণ করেই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা বাংলাদেশ বা কাশ্মীর বা গোধরার নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য নয়, গুজরাটের ক্ষতিগ্রস্থ মুসলমানদের জন্য রাস্তায় নেমে চাঁদা তুলেছিল। তহবিল তৈরি করেছিল।

বিবিধ

সম্প্রতি একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যে, গান্ধীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার না দিয়ে সুইডেনের নোবেল কমিটি গান্ধীর প্রতি অন্যায় করেছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, ১৯৩৪ সালে আমেরিকার একটি পত্রিকা ক্রিশ্চিয়ান সেঞ্চুরি (Christian Century) সর্বপ্রথম নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য গান্ধীর নাম প্রস্তাব করে। নোবেল পুরস্কার তাকেই দেওয়া উচিত যার নিজস্ব একটি ব্যক্তিত্ব আছে। একজন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দালাল সেই পুরস্কারের দাবিদার হতে পারে না। তাই এ ব্যাপারে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, গান্ধীকে সেই পুরস্কার না দিয়ে নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কারের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

বিগত ১৯২৪ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে একটা বিতর্ক উপস্থিত হয়। সেই সময় চিত্তরঞ্জন দাস, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরু তাদের নিজ

নিজ শহরগুলির পৌরসভায় সভাপতি ছিলেন। তখন তাঁরা তাদের শহরগুলিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে গান্ধী সেই প্রস্তাবের বিরেধিতা করেন। তিনি বলেন যে, কোন জিনিসই বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা উচিত নয়। কারও ওপর জোড় করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার সেই ব্যাপারে স্বাধীনতা থাকা উচিত। যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে, তাকেই শিক্ষা দিতে হবে।

যেই চরকাকে গান্ধী বৃটিশের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসাবে প্রবর্তন করেন, ১৯২৪ সালের পুনা কনফারেন্সে তা পরিত্যক্ত হয়।

১৯২৪ সালের ৫ই জুলাই গান্ধী তার সবরমতী আশ্রম থেকে এক হাস্যকর বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, তিনি ভারতের সম্রাট হলে কি করতেন। সর্বপ্রথম তিনি ভারতের সেনাবাহিনীকে ভেঙে দিতেন। চুরি ডাকাতি রুখতে যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন পুলিশ লাগে সেই কয়জন পুলিশকে রেখে তিনি পুলিশবাহিনীরও ছুটি করিয়ে দিতেন। দেশের হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের তিনি একটা ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন। তারা তাদের সমস্ত ঝগড়া বিবাদ আপোষে মিটিয়ে নেবার পর তিনি দরজা খুলে দিতেন।

১৯২৬ সলের অক্টোবর মাসে গান্ধী একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন যে, জননিয়ন্ত্রণ ও সেই উদ্দেশ্যে গর্ভনিরোধক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা একটা জাতির পক্ষে আত্মহত্যার সামিল।

১৯৩৩ সালের ৮ই মে গান্ধী ২১ দিনের উপবাস শুরু করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, নিজেকে শুদ্ধ করাই এই উপবাসের লক্ষ্য। গান্ধী তখন জেলে ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যা ৬টায় তাকে জেলের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল ও রাত ৯টা নগাদ তাকে লেডি থ্যাকারের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিয়ে যাওয়া হল, কারণ সেখানেই তিনি তার উপবাস শুরু করবেন। এখানে বলে রাখা দরকর যে, গান্ধী যখনই অন্য কোথাও বাস করতেন, তা লেডি থ্যাকারের প্রাসাদ, বা বিড়লাদের প্রাসাদ, বা আগা খাঁ-র প্রাসাদ হোক না কেন, তাকে পর্ণকুটীর বলা হত এবং খবরের কাগজেও তাই ছাপা হত।

যাই হোক, ১৩ই মে কস্তুরবা গান্ধীকেও মুক্ত করে দেওয়া হল এবং তাঁকে লেডি থ্যাকারের প্রাসাদে পাঠিয়ে দেওয়া হল গান্ধী কে দেখাশুনা করার জন্য। সেই রাত্রেই তিনি কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি এম এস আনে-কে নির্দেশে দিলেন অসহযোগ সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে নিতে। শ্রী আনেও তার নির্দেশ মত অসহযোগ আন্দোলন তুলে নেবার জন্য ঘোষণা জারি করলেন। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বলেন যে, বৃটিশের নির্দেশে যখনই কোন আন্দোলন তুলে নিতেন, তখনই তিনি নিজের শয়তানিকে চাপা দেবার জন্য বা দেশের মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য অনশন শুরু করতেন।

গান্ধী ভণ্ড জাতীয়তাবাদী

যাই হোক, ১৯১৫ সালে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এলেন বা তাকে ফিরিয়ে আনা হল। ভারতের মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রচার মাধ্যম, যা নাকি পুরোপুটি বৃটিশ ও তার তাঁবেদারদের দ্বারা পরিচালিত, তাকে মহাত্মা আখ্যা দিয়ে রাতারাতি এক মহামানবে পরিণত করল। বিশেষ করে তাঁর চম্পারণের সত্যাগ্রহ, খেদ্য আন্দোলন ও আহমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের আন্দোলনকে অভিনব ও অভূতপূর্ব আখ্যা দিয়ে এবং মহান সাফল্য বলে প্রচার করে সংবাদ মাধ্যম তাকে ভারতের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করল এবং তাঁর অহিংসার পথকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র পথ বলে প্রতিষ্ঠিত করল।

প্রচার মাধ্যমে যদি কাউকে নেতা বানাতে চায় তাহলে যে সে কত সহজে ও কত অল্প সময়ের মধ্যে তা করতে পারে তা কারও অজনা নয়। অল্প কিছুদিন আগে শিক্ষাদীক্ষাহিন একজন বিমান চালককে প্রচারযন্ত্র কত তাড়াতাড়ি একজন মহান নেতায় পরিণত করেছিল তা ভারতবর্ষের মানুষ ভুলে যায়নি। তারও অল্প কিছুদিন আগে ঐ বিমান চালকের ছোট ভাইকে সংবাদ মাধ্যমে একই কায়দায় নেতা বানিয়েছিল এবং তার অসভ্যতাকে যৌবনের তেজবীর্য বলে আখ্যা দিয়েছিল। অনেকের হয়তো স্মরণ আছে যে, ইংল্যাণ্ডে বাসকালে ঐ যুবক অসভ্যতার জন্য বিলাতের ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল এবং পরে নিজের নাম বদল করে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিল। সম্ভবত এ ব্যাপারে তার খ্যাতিমান মাতামহের প্রভাব পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করে থাকবে। উপরন্তু আমাদের প্রচারযন্ত্রের একটা অংশ আজও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে, কবে সেই বিমান চালকের নাবালক পুত্র-কণ্যা সাবালক হবে এবং তাদের নেতা বানাবার কাজে লেগে পড়বে। ইতিমধ্যে তারা সেই বিমান চালকের বিধবা পত্নীকে নেতা বানাবার কাজে লেগে পড়েছে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে সেই বিমান চালক দেশকে বিদেশী ঋণের জলে জড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেশের জন্য করে যেতে পারেননি। তিনি তাঁর স্বল্প শাসনকলের মধ্যে দেশের বৈদেশিক ঋণ ২৩৫০ কোটি থেকে বাড়িয়ে শুধু ৮৬৫০ কোটি মার্কিন ডলার করে যেতে পেরেছেন।

উপরোক্ত কর্মকাণ্ডের ফল দাঁড়াল এই যে, কংগ্রেসের মধ্যে যে সমস্ত জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও তেজস্বী নেতারা ছিলেন, যাঁরা বৃটিশকে বলপূর্বক দেশ থেকে বিতারণ

করতে চাইতেন তারা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এবং তাঁদের মতবাদ একটা বিক্রূপে বিদ্বেষে পর্যবসিত হল। অপর দিকে কংগ্রেস কতগুলো ধামাধরা, বৃটিশের পদলেহী, দেশদ্রোহী কাপুরুষের আড্ডাখানায় পরিণত হল। এতে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ যে সংগঠন বিদেশী আততায়ীদের মোকাবিলা করার জন্য তামসিক পথ বেছে নিল, সেই সংগঠন শুধু তামসিক লোকদেরই ভীড় বাড়তে থাকল। যেই বৃটিশ তাদের পক্ষে বিপজ্জনক দেশপ্রেমিক নেতাদের ফাঁসিতে লটকাতে বা দ্বীপান্তরের নমে আন্দোলনে নিয়ে গিতে হত্যা করতে কসুর করল না, সেই বৃটিশই এই দেশদ্রোহী কংগ্রেস নেতাদের মাঝে মাঝে গ্রেপতার করে, প্রথম শ্রেণীর জেলে রেখে তাদের ভাবমূর্তি বাড়িয়ে যাবার কাজ চালিয়ে যেতে থাকল। গান্ধীজির অহিংস নীতিকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল দর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরে বৃটিশের পক্ষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা সম্ভব হল, কারণ তাদের বুঝতে বাকী থাকল না যে, এর ফলে (১) তারা যতরকম অত্যাচার-উৎপীড়ন সম্ভব তার দ্বারা যতদিন ইচ্ছা ভারত শাসন করতে পারবে, (২) ভবিষ্যতে ভারতের মাটিতে কোন ইয়োরোপিয়ানের জীবন বিপন্ন হবে না, (৩) ভারতের মানুষ গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলনের খেলায় মেতে থাকবে এবং এতে করে তাদের রাগ-দ্বেষ সময় সময় অহিংসার সেফটি ভালভ দিয়ে বেরিয়ে যাবার জন্য তা আর বিস্ফোরণের পর্যায়ে যাবে না এবং (৪) কালক্রমে ভারতবর্ষ একটা কাপুরুষ ও নপুংসকের দেশে পরিণত হবে।

আজ এটা বিচার করার সময় এসেছে যে কোন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের পক্ষে কোন দখলদার বৃটিশ অফিসরের পত্নীর প্রতি ঘৃণা জন্মানোটা স্বাভাবিক না তার সঙ্গে গোপন প্রেম করার রুচি জন্মানোটা স্বাভাবিক! আর এটাও দিবালোকের মতই পরিষ্কার যে, বৃটিশ লালা লাজপৎ রায়ের মত একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতাকে প্রকাশ্য রাস্তায় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারতে পারে সেই বৃটিশের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় যে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক নেতাকে কোন বৃটিশ অফিসারের পত্নীর সঙ্গে প্রেম করার সুযোগ দেবে। তাকে দেখামাত্র গ্রেফতার করার আদেশ দেওয়াটাই বৃটিশের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল, সেই নেতা প্রকৃত দেশপ্রমিক হলে তিনি কখনই জীপ কেনার নাম করে সেই মহিলাকে ভারতীয় রাজকোষ থেকে অন্যায়ভাবে মোটা টাকা পাইয়ে দিতে পারতেন ন।

আর এই সমস্ত কারণেই এইসব অহিংসক নেতারা দেশের মানুষের মধ্যে বিন্দুমাত্র জাতীয়তাবোধ ও দেশভক্তি জাগিয়ে তুলতে পারেন নি। বিগত ৫০ বছরের শাসনের ফলে তারা দেশকে ক্রমাগত অবনতির দিকেই নিয়ে গেছেন এবং দেশের অর্থনৈতিক দৈন্য আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা

ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই। তাই তারা বর্তমানে দেশকে বিদেশের কাছে বিক্রি করে দেবার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন।

গান্ধীর ব্রহ্মচর্য

স্বাধীনতার জন্য অহিংস সত্যাগ্রহের নামে গান্ধী যে বৃটিশের দালালী করেছেন তা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর জীবনের আর একটি সংগ্রামের কথাও পাঠকের সামনে তুলে ধরা দরকার, আর সেটা হল তাঁর ব্রহ্মচর্য রক্ষার সংগ্রাম। ১৯০৩ সালে, যখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর, অর্থাৎ তিনি যখন তাঁর তারুণ্যের মধ্য গগনে, সেই সময় তিনি হঠাৎ প্রতিজ্ঞা করে বসলেন যে তিনি ব্রহ্মচর্য রক্ষা করবেন (D Keer, P-73) এবং বাকী জীবনটা ব্রহ্মচারী হিসাবেই কাটাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, অত্যাধিক কামুক গান্ধী হঠাৎ কেন এ রকম একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসলেন? গান্ধী এতটাই কামুক ছিলেন যে, তাঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধী যখন মৃত্যু শয্যায় তখন তিনি সেই একই বাড়ির অন্য এক ঘরে স্ত্রী কস্তুরবার সঙ্গে রতিলীলায় ব্যস্ত ছিলেন। মৃত্যু পথযাত্রী পিতার কাছে থাকার চাইতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়লীলা ও রতিলীলাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছিল।

এ রকম একজন কামুক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য পালন করবেন শুনলে প্রথমেই সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন দুর্বদ্ধি বা লাম্পট্য লুকিয়ে ছিল। অনেকের মতে সেই সময় তিন পুত্রের জননী নিরক্ষর কস্তুরবার প্রতি তাঁর অরুচি ধরে গিয়েছিল। কস্তুরবার শয্যাসঙ্গিনী হতে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। তাই ব্রহ্মচর্য পালনের নামে কস্তুরবার শয্যা ত্যাগ করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

১৮৮২ সালে যখন গান্ধীর সঙ্গে কস্তুরবার বিয়ে হয় তখন গান্ধীর বয়স ছিল ১৩ এবং কস্তুরবার বয়স ছিল ১৪ বছর। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওকালতি করার সূত্রে সেই সময় অনেক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হতে থাকে। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে গান্ধী বিশেষ রকম আনন্দ পেতেন, যা কস্তুরবার থেকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে সেই সব মহিলাদের শিক্ষার জৌলুস গান্ধীকে খুবই আকর্ষণ করতো। সেই সময় অনেক বিশেষ ব্যক্তিদের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যেত। স্ত্রীর মতেই হোক আর অমতেই হোক, তারা মিস্ট্রেস নিয়োগ করতো। তাই গান্ধীর মধ্যেও এই প্রবণতা তৈরি হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

অন্যান্য প্রবণতার মত যৌনতাও মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা, যার জন্য লজ্জা পাবার বা সংকোচ বোধ করারও কোন কারণ নেই। মানুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে তা চরিতার্থ করে থাকে। (শ্রী অরবিন্দ শ্রী মায়ের মধ্য দিয়ে তা চরিতার্থ করতেন (M V Kamath,

Mahatma and celibacy, organiser-2.7.06)। কিন্তু গান্ধী বিশেষ কোন একজন মহিলার মধ্যে তা সীমিত রাখলেন না। অন্তত এক ডজন মহিলা গান্ধীর খুব নিকট সম্পর্কে এসেছিলেন। এদের মধ্যে ছয় জন ছিলেন বিদেশিনী। এরা হলেন গ্রাহাম পোলক (GRAHAM POLAK), নীলা ক্র্যাম কুক (NILLA CRAM COOK), মীরাবেন (MADELLINE SLADE), মার্গারেট স্পিগেল (MARGARATE SPIEGEL), সোনজা স্লেচিন (SONJA SCHLESIN) ও এস্থার ফেরিং (ESTHER FAERING)। ঘনিষ্ঠ ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে যাদের নাম করা যায় তাঁরা হলেন জয়প্রকাশ নারায়ণের পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, কাঞ্চন শাহ, প্রেমা বেন কণ্টক, সুশীলা নায়ার, মানু গান্ধী ও সরলাদেবী চৌধুরাণী। এই সরলাদেবী ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী (দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে)।

সরলাদেবী গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী গিরিজা কুমার (auther of the book Brahmacharya : Gandhi and his Women Associates) লিখছেন "Saraladevi Chodhurani came very close to Mohanda Karamchand Gandhi. Their whirl wind romance lasted for barely two years, but it upset the balance of the Gandhian establishment and shook its very roots. She is now a part of history and a footnote in comtemporary Gandhian literature. She, however, left a scar in the minds of Gandhiji for the rest of his life." অর্থাৎ "সরলাদেবী চৌধুরাণী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর খুবই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁদের সেই উদ্দাম প্রেমলীলার আয়ু মাত্র দু বছর হলেও তা গান্ধীর আদর্শ ও নিষ্ঠার ভারসাম্য নষ্ট করে ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আজ তাঁর নাম গান্ধীর জীবনী ইত্যাদি গ্রন্থে শুধু একটা ফুটনোটের মাধ্যমে প্রকাশ পেলেও তাঁর স্মৃতি গান্ধী সারা জীবনে ভুলতে পারেননি।" এই সরলাদেবীকে গান্ধী তাঁর পরমার্থিক পত্নী বলতেন। গান্ধী নিজেই স্বীকার করতেন যে, সরলাদেবীর সঙ্গে তাঁর প্রেম শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত এগিয়েছিল।

সরলাদেবী ছাড়া দ্বিতীয় যে মহিলার সঙ্গে অতিশয় অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে শ্রী গিরিজা কুমার লিখছেন, "Prabhvati became so obssessed with Gandhi that she would not tolerate separation from him even for a single day...Her hysteria was highest manifestation of her desperation. She would remain unconscious for hours together..." অর্থাৎ, প্রভাবতী গান্ধীর প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পরেছিলেন যে, গান্ধীর সঙ্গে দেখা না করে তিনি এক দিনও কাটাতে পারতেন না। এই আসক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে গেলে তিনি হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রুগীর মত অজ্ঞান হয়ে যেতেন। এইভাবে

তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অচৈতন্য হয়ে পরে থাকতেন। একমাত্র গান্ধী মারা যাবার পরেই প্রভাবতী দেবী তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে সক্ষম হন। একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে গান্ধীর এই ফষ্টি নষ্টি অতি বড় গান্ধীভক্তের পক্ষেও সমর্থন করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এইভাবে গান্ধী, শুধু মাত্র নিজের খেয়াল খুশি ও আমোদ প্রমোদের জন্য, প্রভাবতী দেবীর মত আরও অনেক মহিলার জীবন সম্পূর্ণ বরবাদ করে দিয়েছিলেন। (Organiser-2.7.06) তাঁর অন্য প্রেমিকা প্রেমা বেন কণ্টন গান্ধীর প্রেমলীলা বর্ণনা করে ১৯৩৮ সালে Prasad and Diksha নামে একটি বই লেখেন। এর ফলে তাঁর যৌনতা নিয়ে নিন্দা ও সমালোচনায় সারা মহারাষ্ট্র সরগরম হয়ে ওঠে।

যাই হোক, ১৯১৫ সালে পাকাপাকি ভারতে এসে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ভণ্ড ব্রহ্মচর্য রক্ষার আড়ালে অত্যন্ত খোলাখুলি দৃষ্টিকটূভাবে তিনি নারীসঙ্গ শুরু করে দিলেন। এই নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই আশ্রমের অন্যান্য আবাসিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হোল। ক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল গান্ধীর দ্বিচারিতা। "আশ্রমের অন্যদের জন্য নারী-পরিবর্জনের কঠোর বিধান। এ দিকে নিজেকে বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে রেখেছেন, কেননা তিনি ছিলেন অর্ধনারীশ্বর, কামগন্ধহীন" (গান্ধী নারী ব্রহ্মচারী ঃ যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫/৬/২০০৬)। সাফাই হিসাবে গান্ধী বলতেন যে, তিনি সকলের মা, তাই সব মেয়েরাই তাঁর মা ও বোন মাত্র। সাফাই হিসাবে তিনি আরও বলতেন যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরাত্মা (বা inner voice)র নির্দেশেই, বা ঈশ্বরের আদেশেই তিনি এই সব যৌনতা করতেন।

যাই হোক, এর ফলে তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্য ও নারীসঙ্গ কিছু দিন বন্ধ রাখলেন বটে, তবে তার পরেই শুরু হল ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার নামে চরম নগ্ন ভাবে নারী সম্ভোগ। বহু যুবতী নারীর সঙ্গে এক সঙ্গে এক ঘরে নগ্ন অবস্থায় রাত্রি যাপন। প্রথম দিকে তিনি এক ঘরে রাত্রি যাপন করলেও, তাঁর জন্যও মেয়েদের জন্য পৃথক শয্যার ব্যবস্থা থাকতো। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই তিনি তাঁর অনুগামী অনেক মেয়ের সঙ্গে একই বিছানায় নগ্ন হয়ে শুতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতেন যে, এভাবে এক বিছানায় শুলে রাত্রে শরীর গরম থাকে এবং শরীরের প্রাকৃতিক চিকিৎসা হয় (Patricia Caplan (1987). The cultural construction of sexuality, Routledge. pp. 278 & Parekh, Bhikhu C. (1999). Colonialism, Tradition and Reform : An Analysis of Gandhi's Political Discourse, Sage. pp-210)। তিনি আরও বলতেন যে, এভাবে এতগুলো নগ্ন মেয়ের সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে তিনি তাঁর সংযম ও ব্রহ্মচর্য পরীক্ষা করতেন, অর্থাৎ তাঁর লিঙ্গ দৃঢ় হোত না (Kumar, Girja (1997). The Book on Trial : Foundamentalism and Censorship in India, Har-Anand Publications. pp. 98) এবং ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে জি ডি বিড়লাকে লেখা পত্র)।

অনেকের কাছেই এটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না যে, অহিংসা বাদে যৌনতাই ছিল তাঁর আলোচনার ও পত্র লেখার বিষয়বস্তু। সেই সময়কার হরিজন পত্রিকার পর পর পাঁচটা সংখ্যার সম্পাদকীয় কলমের বিষয় ছিল তাঁর এই ব্রহ্মচর্য নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা বিষয় (Kumar, Girja (1997). The Book on Trial : Fundamentalism and Censorship in India, Har-Anand Publications. pp. 98.)। সাধারণত যৌবনেই পুরুষের স্বপ্নে বীর্যপাত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে মাসে অন্তত একবার তাঁর স্বপ্নে বীর্য স্খলন হোত। ১৯৩৬ সালে, যখন তাঁর বয়স ৬৭ বছর, প্রৌঢ় গান্ধী মুম্বাইতে তাঁর স্বপ্নে বীর্যপাতের কথা স্বীকার করেন। গান্ধী কতখানি কামুক ছিলেন, এই একটা ঘটনাই তা প্রমাণ করতে যথেষ্ট। গান্ধী স্বীকার করে গিয়েছেন যে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই যৌনতার আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি (Mahatma Gandhi, D Keer, ibid, p-678)।

এইভাবে অনেক নগ্ন নারীর সঙ্গে নগ্ন হয়ে এক বিছানায় শুয়ে নিজেকে সংযত রাখাকে গান্ধী সক্রিয় ব্রহ্মচর্য বা A.C. (Active celebay) বলতেন। নিজের নাতি কানু গান্ধীর স্ত্রী, ১৬ বছরের আভা গান্ধী সহ আরও অনেক মহিলার সঙ্গে গান্ধী তাঁর এই ব্রহ্মচর্যের পরীক্ষা চালান। এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার নামে গান্ধী যে তাদের শুধু ব্যবহার করতেন তাই নয়, তিনি তাদের মতামত গ্রাহ্য না করে তাদের ওপর এক প্রকার যৌন অত্যাচার চালাতেন। তাদেরও এইসব অত্যাচার মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না (গান্ধী নারী ব্রহ্মচারী ঃ যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫/৬/২০০৬)। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর সর্বপ্রধান শিষ্য ও একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী, আচার্য বিনোবা ভাবে এক সময় বলেন যে, ব্রহ্মচর্য নিয়ে এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করার গান্ধীর কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে-হয় না। এক জন খাঁটি ব্রহ্মচারী কখনও ব্রহ্মচর্য নিয়ে এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে যাবে না এবং কোন ব্যক্তি, যিনি ব্রহ্মচর্যের শিক্ষা নিচ্ছেন, তিনিও নৈতিক কারণে এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা বর্জন করবেন। কিন্তু গান্ধী বলতেন যে, তাঁর এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা খুবই সফল ও ফলপ্রসু হয়েছিল (Tidrick, Kathryn (2007). Gandhi : A Political and spiritual Life, I.B. tausris. pp. 302-304)।

এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য গান্ধীর শিকার হয়েছিল তাঁর আর এক নাতনী, জয়সুখলাল গান্ধীর মেয়ে ১৯ বছর বয়সী মানু গান্ধী। মানুকে নিজের শয্যা সঙ্গিনী করে গান্ধী জয়সুখলাল গান্ধীকে চিঠি লিখলেন, "মানুর ক্রটিপূর্ণ শোয়াকে ঠিক করতে আমি ওকে আমার বিছানায় নিয়ে ঘুমাচ্ছি" (Tidrick, Kathryn (2207). G andhi : A

Polit ical and Spiritual Life, I.B. Tauris. pp. 302-304.)। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধী নোয়াখালী ভ্রমণে যান। কিছু দিন আগেই সেখানে ঘটে গিয়েছে হিন্দু মেধ যজ্ঞ। সেই শোকাচ্ছন্ন, হিন্দুর রক্তে সিক্ত নোয়াখালিতে গান্ধীর শয্যাসঙ্গিনী হতেন মানু গান্ধী। গান্ধী বলতেন নগ্ন মানু গান্ধীর সঙ্গে নগ্ন হয়ে এক বিছানায় শোবার ফলে তিনি নানাভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। এর ফলেই তিনি দেশভাগ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাগুলো সঠিকভাবে বিচার বিবেচনা করতে সমর্থ হন। গান্ধী অন্য সবাইকে বলতেন মানু গান্ধীর সঙ্গে তিনি মা'র মত শুয়ে থাকতেন এবং "আভা ও মানু গান্ধী হল আমার হাটবার লাঠি"। এখানে বলে রাখা দরকার যে, মানু গান্ধী ছিল বিবাহিত এবং তার স্বামীর নাম ছিল সুরেন্দ্র মাশ্রুওয়ালা।

১৯৪৫ সলের মার্চ মাসে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "এইসব মহিলাদের সঙ্গে এক বিছানায় নগ্ন হয়ে শোবার ফলে আমি ব্রহ্মচর্য রক্ষার ব্যাপারে প্রভূত সাফল্য লাভ করি। আগে আমি কস্তুরবার সঙ্গেও এইসব পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে এতটা সাফল্য পাইনি।" (Tidick, Kathryn (2007). Gandhi : A Political and spiritual Life, I. B. Tauris. pp. 302-304)। ব্রহ্মচর্য নিয়ে এই সব পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে গান্ধী স্বাভাবিক কারণেই অনেকের তীক্ষ্ম সমালোচনার শিকার হন। এদের মধ্যে অনেক মহান গান্ধাবাদীও ছিলেন। তাঁর স্টেনোগ্রাফার আর পি পরশুরাম একদিন তাঁকে ও মানু গান্ধীকে এক সঙ্গে শুয়ে থাকতে দেখে পদত্যাগপত্র দিয়ে কাজ ছেড়ে চলে যান (Kumar, Girja (1997). The Book on Trial : Fundamentalism and Censorship in India, Har-Anand Publishers. pp. 73-107)। গান্ধী তাকে বললেন যে, তিনি ইচ্ছা হলে থাকতেও পারেন, ইচ্ছা হলে যেতেও পারেন।

গান্ধীর আর এক অনুগত ভক্ত ছিলেন নির্মল কুমার বসু। নোয়াখালি ভ্রমণের সময়, ১৯৪৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর, গান্ধী মানু ও সুশীলা নায়ারের সঙ্গে শুয়েছিলেন। সুশীলা নায়ার ছিলেন ডাক্তার ও তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল গান্ধীর শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা। হঠাৎ "ভোর রাতে গান্ধীর ঘর থেকে শুনতে পাওয়া গেল তীক্ষ্ম চিৎকার, তারপর চপেটাঘাতের শব্দ"। সেদিন কি ঘটেছিল তা মানু বা সুশীল কাউকেই কোন দিন বলেন নি। তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ব্রহ্মচর্য পরীক্ষার নামে তিনি অনিচ্ছুক সুশীলা নায়ারকে ধর্ষণ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুশীলা বাধা দেন এবং চীৎকার করে ওঠেন। ফলে ব্যর্থ গান্ধী, হতাশা ও ক্ষোভে কপালে চড় মেরেছিলেন এবং টেবিলে কপাল ঠুকেছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই জে বি কৃপালনী ও নির্মল কুমার, গান্ধীর সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং ১৯৪৭ সালের ১৮ই মার্চ নির্মলবাবু গান্ধীর সংস্পর্শ ত্যাগ করেন (Ghose, Sankar (1991). Mahatma Gandhi, Allied Publisher. pp.

356, D Keer, p-759 ও গান্ধী নারী ব্রহ্মচারী ঃ যশোধরা রায়চৌধুরী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫/৬/২০০৬)। পরে নির্মলবাবু একটি অভিযোগে বিস্তারিত ভাবে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন—আপনি এই সব পরীক্ষা করে জানতে চেয়েছিলেন যে, নগ্ন মেয়েদের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করলে আপনার বা আপনার সঙ্গিনীদের মধ্যে কোনও কামভাব জাগরূক হয় কি না। কিন্তু আমার সংশয় হয় যে, আপনার সঙ্গে থাকবার ফলে এই মেয়েদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না তো। যদিও এতে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, নির্মলবাবুর অভিযোগ পত্রের মূল কথা ছিল—আপনি তো এই সব মেয়েদের সঙ্গে শুয়ে ভালই লাম্পট্য সুখ উপভোগ করছেন, কিন্তু সর্বনাশ করছেন মেয়েগুলোর।

ভারতের স্বাধীনতা বিষয়ে গান্ধীর কোন অবদান নেই

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাবার পর থেকে এইসব অহিংসার পূজারীরা দিনরাত দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে বলে চলেছেন যে, অনেক কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করার পর গান্ধী ও তার অহিংসার তত্ত্ব দেশবাসীকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা যদি আমরা অর্জনই করে থাকি তাহলে তা দেশ বিভাগের গ্লানির মধ্য দিয়ে গেলাম কেন? যদি আমরা স্বাধীনতা নিজের ক্ষমতায় অর্জন করতাম তাহলে আগে ভারত স্বাধীন হত, তারপর ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা ঠিক করত যে তারা একই রাষ্ট্রে থাকবে না ভারতকে ভাগ করবে। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত মত ভারত বিভাজন হত না। আর কংগ্রেস যদি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মানুষের সংগঠন হত তাহলে দেশমায়ের অঙ্গচ্ছেদের মধ্য দিয়ে পাওয়া এই স্বাধীনতা তারা মেনে নিল কি করে? আসল ব্যাপার হল, যারা উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশী তারা তাতেই আনন্দিত হয়। যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই তারা ভিক্ষাতেই সন্তুষ্ট হয়। যারা কাপুরুষ তারা অপমানজনক সন্ধিতেই সন্তুষ্ট হয়।

১৯৪৫ সালের পর ১৫ বছরের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রায় ৬০ দেশ, বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছে। এটা কি করে সম্ভব হল? আমাদের গান্ধীবাদী অহিংস নেতারা কেমন করে এই ঐতিহাসিক ঘটনকে ব্যাখ্যা করবেন? গান্ধী কি সব দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের আমাদের স্বাধীনতা একটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধর পর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ নয়া সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয় এবং এরই ফলস্বরূপ ভারত সহ আরও ৬০টি দেশ স্বাধীন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য বৃটেন সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা আমেরিকার কাছ থেকে যে টাকা ধার করে,

যুদ্ধ শেষে তা ফেরত দিতে তারা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এই কারণেই সমস্ত কলোনীগুলোর স্বত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তাদের চলে যেতে হয়। কাজেই বলা চলে যে, ১৯৪৭ সালের ভারতের স্বাধীনতা তৎকালীন মার্কিন রাস্ট্রপতি রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এ্যাট্‌লীর মধ্যেকার গোপন শলাপরামর্শের ফল। এতে গান্ধী ও তার অহিংস আন্দোলনের বিন্দুমাত্র অবদান নেই। গান্ধী আরও হাজার সত্যাগ্রহ করেও ভারত স্বাধীন করতে পারতেন না, যদি না ইয়োরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হত। এটা আমাদের অহিংস নেতারা খুব ভাল করেই জানেন এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশবাসীকেও বুঝতে হবে যে, একটা ক্ষুধার্ত হায়না যখন শিকার ধরে তার রক্ত খায় তখন অহিংসার মধুর কথায় সে শিকার ছেড়ে পালায় না।

উপসংহার

উপসংহার হিসাবে বলা যায় যে গীতায় নিষ্কাম কর্ম ও তেজবীর্যের আদর্শকে অনুসরণ করেই ভরতবর্ষ এককালে শৌর্য, বীর্য, জ্ঞান-গরিমা, সম্পদে ও প্রাচুর্যে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের ধর্মাচার্যগণ কর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ধর্মের কথাই বেশী প্রচার করলেন এবং কর্ম ত্যাগ ও সন্ন্যাসকেই বেশী প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু সাধকরাই তা অনুসরণ করতে পারল, আর বাদবাকী সাধারণ মানুষ সত্ত্বগুণের নামে তমোগুণে নিমজ্জিত হল। এইভাবে ভারতবর্ষ একটি শৌর্যবীর্যহীন কাপুরুষের দেশে পরিণত হল, পক্ষান্তরে কর্মত্যাগ, সন্ন্যাস, মোক্ষ, ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর এত বেশী জোর দেবার ফলে ভারতবর্ষ ঘোর তমসায় নিমজ্জিত হল। এর ফলশ্রুতি হিসাবেই এই ভারতবর্ষ বিভিন্ন বিদেশীর দ্বারা পদদলিত হতে থাকল।

অবক্ষয় এতদূর গড়াল যে, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর রাজারা তাদের সাধারণ প্রজাদের গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের মধ্যে যৌনতা প্রচার করায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এই কারণেই এইসব রাজারা খাজুরাহো, পুরী বা কোনারকের মন্দিরের গায়ে নরনারীরর যৌন মিলনের দৃশ্য উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কোনারকের সূর্য মন্দিরের প্রধান দরজার দুই পাশে রক্ষিত দুই পাথরের মূর্তি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা সমীচিন হবে। এই মূর্তি দুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, একজন লোক মাটিতে পড়ে আছে ও একটি হাতী তাকে পদদলিত করেছে। উপর থেকে একটি সিংহ হাতিটাকে আক্রমণ করে তার কবল থেকে মানুষটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। এখানে মানুষটা "মানব ধর্ম"-এরই প্রতীক, হাতিটা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক এবং সিংহটা সনাতন ধর্মের প্রতীক। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, সে সময় ঐ মূর্তি দুটো তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়

সমাজের অবক্ষয় কোথায় পৌঁছেছিল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এই অবক্ষয়ের জন্যই মুসলমান আক্রমণকারীদের পক্ষে এই দেশ জয় করা সহজতর হয়েছিল। ঠিক এই কারণেই লর্ড ক্লাইভের ৩০০ বৃটিশ সৈন্যের বিজয় মিছিল ৩,০০,০০০ দেশিয় দর্শকের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবদে পৌঁছতে পেরেছিল। ঠিক এই কারণেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন বৃটিশ অফিসারের সাহায্যে ইংরাজরা এই বিশাল দেশ ২০০ বছর ধরে শাসন করতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত, বিধাতার নির্দেশে গান্ধীজি এই জাতিকে শেষ আঘাত হানলেন, তাঁর অহিংস তত্ত্বের দ্বারা ভারতবর্ষকে একটা তামসিক ক্রীতদাসের দেশে পরিণত করলেন। আর এই কারণেই দেশের লোকের মধ্যে নৈতিক চরিত্র বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকল না। সমষ্টির জন্য চিন্তা করা বা ভাবা আজ একটা হাস্যকর ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে। দেশ থেকে দণ্ড উঠে গেছে এবং নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের লোকে যে কোন রকমের গর্হিত কাজ ও দুষ্কর্ম করতে উদ্যত হচ্ছে।

ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষায় অনুপ্রাণিত গান্ধী সম্ভবত প্রথম জীবনে ভারতীয় পুঁথিপত্র পড়ে দেখার প্রয়োজন অনুভব করেননি বা সময় করে উঠতে পারেননি। কিন্তু শেষের দিকে যে তিনি ঐ সমস্ত পুঁথিপত্রের কিছুটা অধ্যয়ন করেছিলেন সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই সময় তিনি তাঁর অহিংসার তত্ত্বের যে সমস্ত ব্যাখ্যা দিলেন তাতে দেখা যায় যে, পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগের সঙ্গে তার তত্ত্বের কোনই প্রভেদ নেই। উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন তিনি তার "জীবন ব্রত" গ্রন্থে বলেন যে, সত্য বা ঈশ্বরকে লাভ করাই সকল মানুষের জীবনের ব্রত বা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সত্য লাভের ব্রত উদ্‌যাপন করতে গেলে যে আনুষাঙ্গিক ব্রতগুলি পালন করতে হবে তা হল, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অস্বাদ, অস্তেয়, অপরিগ্রহ অভয়, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, কায়িক শ্রম ও সম্রতা। অহিংসার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, "কাহাকেও না মারা তো আছেই, উত্তেজিত হওয়াও হিংসা, মিথ্যা ভাষণ হিংসা, দ্বেষও হিংসা। কাহারও মন্দ কামনা করাও হিংসা।" (পৃঃ ৭)

কাজেই পাতঞ্জল যোগের মত গান্ধীজির অহিংস ব্রতধারীকেও অবশ্যই ব্রহ্মচর্য রক্ষা করতে হবে—"আবার অহিংসা ব্রত পালনের কথা ধর, তাহাও পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া হইতে পারে না" (পৃঃ ৮)। "সেইজন্যই যে অহিংসাব্রত পালন করতে চায় তাহার বিবাহ করা চলে না" (পৃঃ ৯)। "কিন্তু যে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার উপায় কি? বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ যখন একে অপরকে ভাই-ভগ্নীর মত গণ্য করে তখন অপর সকল জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ঐ ব্রহ্মচর্য কায়মনবাক্যে করতে হয়" (পৃঃ ৯)। কাজেই উপরিউক্ত মন্তব্যগুলি থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পাতঞ্জল যোগের মত

তাঁর অহিংসাও সর্বসাধারণের পালনীয় ধর্ম হতে পারে না। মুষ্টিমেয় কিছু জিতেন্দ্রিয় সাধু মহাত্মার জন্যই তা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি অহিংসার সাথে ব্রহ্মচর্য ও পালন করে সেই সত্যিকারের সাত্ত্বিক অহিংসা ব্রতধারী। কিন্তু যে বলে যে সে অহিংসা ব্রতধারী, কিন্তু ব্রহ্মচর্য পালন করে না, তাকে অবশ্যই তামসিক অহিংসক বা সোজা বাংলায় ভন্ড অহিংসক বলতে হবে। তবে সুখের কথা হল এই যে, গান্ধীজির কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের আপামর জনসাধারণ অহিংসাব্রত পালন করতে শুরু করেনি। তাহলে ভারতবর্ষ এতদিনে জনমানবহীন শ্মশানে পরিণত হত। অথবা শুধু মুসলমানদের দেশে পরিণত হত, কারণ ইসলামে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা শুধু নিষিদ্ধই নয়, পাপও বটে।

গান্ধীজি প্রদর্শিত অহিংসাব্রতের আর একটি অঙ্গ হল অস্বাদ, অর্থাৎ দেহ রক্ষার জন্যই খাদ্য গ্রহণ, রসনা তৃপ্তির জন্য নয়। এ ব্যাপারে তার মত হল, নিষ্ঠার সঙ্গে এই অস্বাদ ব্রত পালন করতে করতে সেই অহিংসা ব্রতধারী এক সময় এক অবস্থায় উপনীত হবে যে তখন আর উনুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্নার প্রয়োজন হবে নে, তৃপ্তির সঙ্গে সব কিছু কাচাই খেয়ে ফেলবে। তাই তিনি লিখেছেন, "বাস্তবিক দেখতে গেলে আদর্শ অবস্থায় অগ্নির ব্যবহারের আবশ্যিকতা খুব কমই, অথবা আদৌ আবশ্যিকতা নাই" (ঐ পৃঃ ১৩)। কাজেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় যে, গান্ধী ও তার পরম অহিংসক সাঙ্গপাঙ্গরা কতদিন ঐ রকম কাঁচা ফলমূল ও কাঁচা তরিতরকারী খেয়ে থেকেছেন? ধরা যেতে পারে যে, সাঙ্গপাঙ্গরা অতটা অহিংসক হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গান্ধীজি নিশ্চয়ই অহিংসা ব্রতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাই অহিংসাব্রতে দীক্ষিত হবার পর থেকে তিনি কি কাঁচা ফলমূল ও শাক-সবজি খেয়েই জীবনধারণ করতেন?

শেষ কথা হিসাবে বলা যায় যে, যে গীতার শিক্ষাকে অনুসরণ করে এই ভারতবর্ষ এককালে জগতের শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছিল, সেই গীতার শিক্ষাই আবার ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। গীতার সেই বাণী অহিংসার বাণী নয়, সেই বাণী হল,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয়্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।। (২/৩)।

পনেরই আগস্ট কি শুধুই আনন্দের দিন?

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশব্যাপী নানারকম আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করে বর্তমান শাসকবর্গ ভারতের জনসাধারণকে এটাই বোঝাতে চাইছেন যে, স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ১৫ আগস্ট শুধু আনন্দ-ফূর্তি করারই দিন। কিন্তু সত্যিই কি তাই? প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শোক পালনের দিনও

বটে। কারণ, ওইদিন দেশ বিভাজন হয়েছে, মাতৃভূমি খন্ডিত হয়েছে। দেশব্যাপী জাতিদাঙ্গায় জন্মভূমি রুধিরলিপ্ত হয়েছে। সরকারী হিসাব মতো দেশ বিভাগের পূর্ব ও পরবর্তী বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৫ লক্ষ জীবনহানি হয়েছে। কিন্তু বেসরকারী মতে প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশি। দ্বিগুণেরও বেশি। আর এইসব সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যে যে তথ্যটা সযত্নে গোপন করা হয় তার হল ওইসব নিহতদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী এছাড়া বেশ কয়েক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর থেকেও বড় কথা হল, দেশ বিভাগের ফলে যে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে তার ফল এখনও ভুগতে হচ্ছে। কিভাবে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তার কোন দিকনির্দেশ আজ স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও আমাদের শাসক গোষ্ঠীর পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭ সালের ১৩ আগস্ট, যেদিন আমাদের তৎকালীন জাতীয় নেতারা কিভাবে আর দুদিন পরে পাওয়া স্বাধীনতাকে বেশ জাকজমকভাবে পালন করা যার সেই উদ্দেশ্যে দিল্লী নগরীকে সাজাতে গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেইদিনই স্যার সীরিল র‍্যাডক্লিফ দেশ বিভাগের মানচিত্রটি চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করলেন। র‍্যাডক্লিফ এর আগে কোনদিন ভারতে আসেন নি। তাই ভারতে ভৌগোলিক চরিত্র এবং ভারতবাসীদের মানসিক চরিত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এইরকম একজন অজ্ঞ লোককে কেন যে দেশ বিভাজনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা দুর্বোধ্য। ভারত পাকিস্তানের মানচিত্র তৈরি করতে সীমান্তের বিভাজন রেখা কিভাবে টানা উচিত ছিল বা কিভাবে টানলে দাঙ্গাবিদ্বেষ কম হত তার কোন ধারণাই তার ছিল না। যেমন লাহোর শহর যে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে তা ভারতের মানুষ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ সমস্ত যুক্তি-বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে সীমান্ত মাত্র ২০ কি ৩০ কিলোমিটার ঘুরিয়ে এমনভাবে আঁকলেন যে লাহোর পাকিস্তানে চলে গেল।

যাই হোক, কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করে, নিজের খামখেয়ালী মতো ভারত-পাকিস্তানের চূড়ান্ত মানচিত্র তৈরি করে ১৩ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তা লর্ড মাউন্টব্যাটেনের হাতে তুলে দিলেন। মিউন্টব্যাটেনও তা জিন্না বা নেহেরু কারো কাছে প্রকাশ না করে গোপন করে রাখলেন। দুদিন পরে ক্ষমতা হাত বদল হবার পর তিনি তা প্রকাশ করলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, আমাদের নেতারা চূড়ান্ত মানচিত্র না দেখে কি ক রে দেশ বিভাজন মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হয়েছিলেন? এ থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, দেশের কি হল না হল তার কথা চিন্তা না করে ক্ষমতা হস্তগত করাটাই আমাদের নেতাদের কাছে একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছিল।

১৫ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ খুব তাড়াহুড়ো করে ভারত ত্যাগ করলেন। মুষ্টিমেয় যে ক'জন ইংরাজ সর্বপ্রথম ভারত ত্যাগ করেন, র‍্যাডকলিফ তার অন্যতম। অনেকের মতে, তিনি ভয় করেছিলেন যে তাঁর দুষ্কৃতের জন্য হয়তো তাঁকে কোন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাতে হবে। অনেকের মতে তিনি তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ডে পৌঁছে তাঁর কাজের মজুরী ২০০০ পাউন্ড গ্রহণ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে, এই দেশ বিভাজন কে এড়ানো সম্ভব ছিল? ল্যারী কলিসন ও ডোমিনিক ল্যাপিয়ে তাঁদের "ফ্রিডম অব মিডনাইট" গ্রন্থে এই অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতা হস্তগত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও লোভ ভারতীয় নেতাদের এত প্রলুব্ধ করে যে, তাদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাঁরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মাউন্টব্যাটেনকে তাগাদা দিতে থাকেন। লেখকদ্বয় আরও অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য তাঁরা বহুদিন থেকেই লালায়িত ছিলেন এবং সুযোগ আসা মাত্র যে কোন মূল্যে তাঁর তা হস্তগত করতে রাজী হন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, র‍্যাডক্লিফের তৈরি চূড়ান্ত মানচিত্রটা দেখাও তাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়নি কেন!

উক্ত লেখকদ্বয় সম্প্রতি আরও একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছেন। ওই সময়ে তোলা জিন্নার বুকের এক্স-রে তে দেখা যায় তাঁর দুটো ফুসফুসই মারাত্মকভাবে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ছিল। জিন্না যে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন তিনি এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, আর ছ'মাসের বেশি তিনি বাঁচবেন না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক বছর বাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই নভেম্বর জিন্না পাকিস্তানের মূল দাবিদার তথা দেশ ভাগের সর্বাপেক্ষ জোরদার প্রবক্তা মারা গেলেন। কাজেই জিন্না মারা গেলে দেশ বিভাগের দাবি অবশ্যই অনেক দুর্বল ও স্তিমিত হয়ে পড়ত। এর থেকে মনে হয় যে, আমাদের জাতীয় নেতারা যদি আর বছর খানেক অপেক্ষা করতেন তাহলে হয়তো দেশ বিভাজন এড়ানো যেত।

